POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ

যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট রহিয়াছে জান্নাতসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তাহারা তথায় বাস করিবে এবং (তোমাদের জন্য সেখানে) পবিত্র জোড়া সমূহ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সন্তুষ্টি (নির্ধারিত) আছে।

(আলে ইমরান, আয়াত: ১৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 3

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 17 ই জানুয়ারী, 2019 10 জামাদি আল আওয়াল 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

ইহাই সত্য কথা যে, মসীহ মৃত্যুলাভ করিয়াছেন; শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। স্মরণ রাখিও ঈসা আর কখনও অবতীর্ণ হইবেন না। কেননা, তিনি 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানী' (অর্থাৎ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে) আয়াতের মর্ম অনুযায়ী কিয়ামতের দিন যে, অস্বীকার করিবেন, তাহাতে পরিষ্কার এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করিবেন না

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

প্রত্যেক অজ্ঞ এবং অত্যাচারী ব্যক্তি যখন দলীল দ্বারা পরাজিত হয়, তখন তরবারি বা বন্দুকের প্রতি হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু এরূপ ধর্ম কিছুতেই খোদাতালার প্রেরিত ধর্ম হইতে পারে না যাহা কেবল তরবারির সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে প্রসার লাভ করিতে পারে না।

যদি তোমরা এরূপ জেহাদ হইতে বিরত হইতে না পার এবং ইহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সাধু ব্যক্তিগণের নামও দাজ্জাল (ধর্মের শত্রু) এবং মুলহেদ (নাস্তিক) রাখ, তাহা হইলে আমি এই দুইটি বাক্য দ্বারা এই বক্তব্য শেষ করিতেছি। **'কুল ইয়া আইয়োহাল কাফেরুনা লা আবুদু মা তাবুদুনা'**

অর্থাৎ 'তুমি বল, হে কাফেরগণ। আমি সেইরূপ ইবাদত করি না যেইরূপে তোমরা ইবাদত কর' (১০৯ঃ২-৩)

অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ ও দলাদলির যুগে তোমাদের তথাকথিত মসীহ এবং মাহদী কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর তরবারি প্রয়োগ করিবেন? সুন্নীগণের মতে শিয়াগণ কি ইহার যোগ্য নহে যে, তাহাদের প্রতি তরবারি চালানো যায় এবং শিয়াগণের বিবেচনায় সুন্নীগণ কি এইরূপ নহে যে, তাহাদিগকে তরবারি দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা যায়? অতএব যেহেতু তোমাদের অভ্যন্তরীণ ফেরকাগুলিই তোমাদের আকিদা (ধর্মীয় বিশ্বাস) অনুসারে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, এমতাবস্থায় তোমরা কার কার সঙ্গে জেহাদ করিবে? কিন্তু স্মরণ রাখিও, খোদা তরবারির মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাঁহার ধর্মকে ঐশী নিদর্শন দ্বারা জগতে বিস্তার করিবেন এবং কেহই তাহা রোধ করিতে পারিবে না এবং স্মরণ রাখিও ঈসা আর কখনও অবতীর্ণ হইবেন না। কেননা, তিনি **'ফালাম্মা তাওয়াফফাইতানী'** (অর্থাৎ যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে- ৫ঃ১১৮- অনুবাদক)

আয়াতের মর্ম অনুযায়ী কিয়ামতের দিন যে, অস্বীকার করিবেন, তাহাতে পরিষ্কার এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আগমন করিবেন না এবং কিয়ামতের দিন তাঁহার অজুহাত ইহাই হইবে যে, খৃষ্টানগণের পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয় তিনি অবগত নহেন। কিয়ামতের পূর্বে যদি তিনি দুনিয়াতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি কি এই উত্তর দিতে পারেন যে, খৃষ্টানদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা কিছুই তিনি জানেন না? অতএব এই আয়াতে তিনি স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে যান নাই। আর যদি কিয়ামতের পূর্বে তাঁহাকে দুনিয়াতে আসিতে হইত এবং ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর বাস করিতে হইত, তাহা হইলে খোাদাতলার সম্মুখে তিনি একথা মিথ্যা বলিয়াছেন যে, খৃষ্টানদের অবস্থা তিনি কিছুই জানেন না। তাঁহার তো বলা উচিত ছিল যে, দ্বিতীয় আভির্ভাবের সময় আমি দুনিয়াতে প্রায় চল্লিশ কোটি খৃষ্টান পাইয়াছি, তাহাদের সকলকেই দেখিয়াছি এবং তাহাদের বিপথগামিতার বিষয় আমি বিশেষভাবে জ্ঞাত আছি, আমি তো পুরষ্কার পাইবার যোগ্য কারণ খৃষ্টানদের সকলকে আমি মুসলমান করিয়াছি এবং ক্রুশগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। 'আমি জ্ঞাত নহি'-এ কথা বলা ঈসা (আ.)-এর পক্ষে কত বড় মিথ্যা হইবে।

মোটকথা, কুরআন শরীফের এই আয়াতে প্রতি পরিষ্কারভাবে ঈসা (আ.)এর এই স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, তিনি দ্বিতীয় বার দুনিয়াতে আগমন করিবেন না এবং ইহাই সত্য কথা যে, মসীহ মৃত্যুলাভ করিয়াছেন; শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।*

এখন খোদাতালা স্বয়ং অবতীর্ণ হইবেন এবং যাহারা সত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করিবেন। খোদাতালার পক্ষে যুদ্ধ করা আপত্তিকর নহে, কেননা তাহা নিদর্শনরূপে হয়, কিন্তু মানুষের পক্ষে যুদ্ধ করা আপত্তিকর কারণ তাহা বল প্রয়োগে হয়।

দক্ষিণ ইটালীর সর্বপেক্ষা বিখ্যাত পত্রিকা

'কেরিয়ার- ডেলাসেরা' নিম্নলিখিত বিস্ময়কর সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছে-

"১২ই জুলাই ১৮৭৯ তারিখ জেরুযালেমে কোর নামীয় এক বৃদ্ধ সন্নাসী পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় একজন বিখ্যাত সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যান। গভর্নর তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের নিকট দুই লক্ষ 'ফ্রাঙ্ক' (এক লক্ষ পৌনে উনিশ হাজার টাকা) সোপর্দ্দ করেন। এই অর্থ বিভিন্ন দেশের মুদ্রায় ছিল, এবং ইহা সেই গুহায় পাওয়া গিয়াছিল, যাহাতে উক্ত সন্নাসী বহুকাল যাবৎ বাস করিতেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন অর্থের সহিত কতিপয় কাগজপত্রও পাইয়াছেন। তাহারা তাহা পাঠ করিতে না পারায়, কতিপয় হিব্রুভাষা বিশেষজ্ঞ পন্ডিত তাহা দেখিবার সুযোগ লাভ করেন। পন্ডিতগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, এই কাগজপত্র অতি প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল। পাঠ করিলে পর তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তু পাওয়া গেল ঃ

"মরিয়ম পুত্র যীশুর সেবক ধীবর পিটার এই প্রণালীতে লোকদিগকে খোদাতালার নামে এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে সম্বোধন করিতেছে।"

উক্ত পত্র এইভাবে শেষ হইতেছে ঃ

"আমি ধীবর পিটার যীশুর নামে এবং আমার জীবনের নব্বই বৎসর বয়সে এই ভালবাসাপূর্ণ কথাগুলি আমার নেতা ও গুরু মরিয়মপুত্র যীশুর মৃত্যুর তিন ঈদ ফাসাহ্ (অর্থাৎ তিন বৎসর পর) প্রভুর পবিত্র গৃহের নিকটবর্তী বোলিয়রের গৃহে লিখিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছি।"

উক্ত পন্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "এই পত্রাদি পিটারের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে। লন্ডন বাইবেল সোসাইটিরও এই অভিমত। বাইবেল সোসাইটি এই কাগজপত্রগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করাইয়া এখন মালিককে চারি লক্ষ 'লরা' (দুই লক্ষ সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা) দিয়া

এরপর ৬ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

সর্বদা শুভ পরিণতির জন্য দোয়া করা উচিত

আনুগত্য এবং নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবীবৃন্দ

হযরত উবায়েদ বিন যায়েদ আনসারী, হযরত যাহের বিন হারাম আল আশজায়ি, হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব, হযরত উবাদাহ বিন খাশখাশ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ এবং হযরত হারিস বিন অউস বিন মায রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আলোচনা।

ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ, যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়া, নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, অশ্লীল কথাবার্তা, হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অপকর্মে লিপ্ত ইহুদী সর্দার কাব বিন মালিকের হত্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং আপত্তিকারীদের আপত্তিসমূহের খণ্ডন।

আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে এসব ফিতনা থেকে রক্ষা করুন আর এ যুগে খোদা প্রেরীত হেদায়েতদাতাকে গ্রহণ করার তৌফীক দিন যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আগমনণ করেছেন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ৭ ডিসেম্বর , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (৭ ফাতাহ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ যেসব সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত উবায়েদ বিন যায়েদ আনসারীর। তার সম্পর্ক ছিল বনু আজলান গোত্রের সাথে। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত মায বিন রিফা তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন - আমি আমার ভাই হযরত খাল্লাদ বিন রাফের সাথে মহানবী (সা.) এর সাথে একটি দুর্বল উটে বসে বদরের অভিমুখে যাত্রা করি। আমাদের সাথে উবায়েদ বিন যায়েদও ছিলেন। আমরা যখন বারিদ নামক স্থানে পৌঁছলাম, যা রওহা নামক স্থানের পেছনে অবস্থিত, তখন আমাদের উট বসে যায়। পূর্বেও কোন সাহাবীর স্মৃতিচারণে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন আমাদের উট বসে যায়। আমি দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! তোমার খাতিরে মানত করছি,যদি আমরা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যাই তাহলে আমরা এই উটের কুরবানী করব। আমরা এই অবস্থাতেই ছিলাম, মহানবী (সা.) আমাদের পাশ দিয়ে যান। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের উভয়ের কী হয়েছে। আমরা তাকে পুরো বৃত্তান্ত শুনাই। তিনি আমাদের কাছে থামেন এবং ওযু করেন। ওযুর অবশিষ্ট পানিতে তাঁর মুখের পবিত্র লালা মিশ্রিত করেন। এরপর তাঁর নির্দেশে আমরা উটের মুখ খুলে দিই। তিনি উটের মুখে কিছুটা পানি ঢেলে দেন। এরপর কিছুটা তার মাথায়, কিছুটা তার ঘাড়ে, কিছুটা তার কাঁধে, কিছুটা তার কুঁজে, কিছুটা তার পিঠে আর কিছুটা তার লেজে ঢেলে দেন। এরপর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! রাফে এবং খাল্লাদকে এই উটের পিঠে করে নিয়ে যাও। তিনি বলেন, এরপর মহানবী (সা.) প্রস্থান করেন। আমরাও যাত্রার জন্য দাঁড়িয়ে যাই এবং যাত্রা করি। এক পর্যায়ে আমরা মহানবী (সা.) এর সাথে মানসাফ নামক স্থানের প্রবেশ পথে মিলিত হই। অর্থাৎ সেখানে গিয়ে মহানবী (সা.) এর সাথে মিলিত হই। কাফেলায় আমাদের উট সর্বাগ্রে ছিল। মহানবী (সা.) আমাদেরকে দেখে মৃদু হাসেন। আমরা সফর অব্যাহত রাখি। এক পর্যায়ে আমরা বদরের প্রান্তরে পৌঁছে যাই। বদর থেকে ফেরার পথে আমাদের উট মুসাল্লা নামক স্থানে পৌঁছে বসে যায়। তখন আমার ভাই এটিকে জবাই করে এর মাংস সদকা হিসেবে বিতরণ করে দেন। এই সফরে তার সাথে হযরত উবায়েদ বিন যায়েদও ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২) (আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৯) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ১ম খণ্ড ,পৃ: ৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০১৩)

আরেকজন সাহাবী ছিলেন হযরত যাহের বিন হারাম আল-আশজাঈ। তিনিও একজন বদরী সাহাবী। তার সম্পর্ক ছিল আশজা গোত্রের সাথে। বদরের যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.) এর সহ-যোদ্ধা ছিলেন। হযরত আনাস বিন মালেক কর্তৃক

বর্ণিত হয়েছে যে, মরুবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি ছিলেন যার নাম ছিল যাহের। তিনি মহানবী (সা.) এর জন্য গ্রামের শাকসবজি নিয়ে আসতেন। তার ফেরার পথে মহানবী (সা.)ও তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধনসম্পদ দিয়ে ফেরত পাঠাতেন। মহানবী (সা.) বলতেন-**'ইন্না যহেরান বাদিয়াতুনা ওয়া নাহনু হাযেরুহু।'** অর্থাৎ যাহের আমাদের গ্রাম্য বন্ধু আর আমরা তার শহুরে বন্ধু। মহানবী (সা.) তাকে ভালোবাসতেন। হযরত যাহের সাদামাটা চেহারার মানুষ ছিলেন। একদিনের ঘটনা, হযরত যাহের বাজারে নিজের কিছু পণ্য বিক্রি করছিলেন। মহানবী (সা.) তার কাছে আসেন। পেছন থেকে তাকে নিজের বুকে টেনে নেন। অপর রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) পেছন থেকে এসে নিজের হাত দ্বারা তার চোখ আবৃত করেন। হযরত যাহের বাহ্যত হুযূরকে দেখছিলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কে? আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু তিনি যখন ফিরে তাকান, তখন মহানবী (সা.) কে দেখেন এবং তাঁকে চিনে ফেলেন। হযরত যাহের কিছুটা পিছনে তাকান, চেহারায় তার দৃষ্টি পড়ে থাকবে, এখানে চেনার অর্থ হলো- কিছুটা ফিরে তাকালে বুঝতে পেরেছেন যে, মহানবী (সা.)। তখন তিনি নিজের পিঠ মহানবী (সা.) এর পবিত্র বক্ষে ঘষতে থাকেন। মহানবী (সা.) রসিকতার ছলে বলা আরম্ভ করেন, কে এই দাসকে ক্রয় করবে। হযরত যাহের নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাহলে তো আপনার ব্যবসা আমার জন্য লোকসানে পর্যবসিত হবে। কে আমাকে ক্রয় করবে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তুমি লোকসানজনক নও। অথবা বলেছেন, খোদার সন্নিধানে তুমি অত্যন্ত মূল্যবান।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ; ৯৮) (আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০৯) (আশশামায়েলুল মুহাম্মদীয়া লিল তিরমিযি, পৃ: ১৪৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদও (রা.) মহানবী (সা.) এর মন রক্ষার এই ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একইভাবে একবার মহানবী (সা.) বাজার অতিক্রম করছিলেন। তিনি দেখেন যে, এক দরিদ্র সাহাবী, যিনি দৈবাৎক্রমে দেখতে কুৎসিতও ছিলেন, প্রচণ্ড দাবদাহে বোঝা বহন করছেন, জিনিসপত্র বহন করছেন, তার পুরো দেহ ঘাম এবং ধুলোর কারণে চিটচিটে দেখাচ্ছিল। মহানবী (সা.) সন্তর্পনে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ান। যেভাবে শিশুরা খেলার ছলে চুপিসারে পেছন থেকে অন্যদের চোখে হাত রাখে আর চায় যে, সে অনুমান করে বলুক কে তার চোখে হাত রেখেছে, একইভাবে মহানবী (সা.) নীরবে তার চোখের ওপর হাত রাখেন। তাঁর (সা.) কোমল হাতের স্পর্শ অনুভব করে তিনি (রা.) বুঝতে পারেন যে, তিনি মহানবী (সা.)। তখন ভালোবাসার উচ্ছ্বাসে তিনি তার ঘর্মাক্ত দেহ মহানবী (সা.) এর পবিত্র পোশাকে ঘষতে আরম্ভ করেন।

হুযূর (সা.) মৃদু হাসতে থাকেন। অবশেষে তিনি বলেন আমার কাছে এক কৃতদাস আছে। কোন ক্রেতা একে ক্রয় করা পছন্দ করবে কি? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল এই পৃথিবীতে কে আমাকে ক্রয় করবে। তিনি বলেন, এমনটি বলো না, খোদার সন্নিধানে তুমি খুবই মূল্যবান।"

(সেরে রূহানী, পৃ: ৪৮৯, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৫)

অতএব বিস্ময়কর ভালোবাসার কল্যাণে সিক্ত হয়েছেন এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ। একবার মহানবী (সা.) বলেন, '**ইন্না লে কুল্লি হাযেরাতিন বাদিয়াতুন। ওয়া বাদিয়াতু আলে মুহাম্মাদিন যাহের ইবনুল হারাম।**' অর্থাৎ প্রত্যেক শহুরে নাগরিকের কোন না কোন গ্রাম্য বন্ধু থেকে থাকে। আর মুহাম্মদ পরিবারের গ্রাম্য বন্ধু হলেন যাহের বিন হারাম। পরবর্তীতে যাহের বিন হারাম কুফায় স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০৯)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব। তিনি হযরত ওমরের বড় ভাই ছিলেন। হযরত ওমরের মুসলমান হওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রারম্ভিক হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, হুদায়বিয়া এবং বয়আতে রিযওয়ানসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত মাআন বিন আদী-র সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এই উভয় সাহাবী ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫০)

ওহুদের দিন হযরত ওমর হযরত যায়েদকে খোদার কসম দিয়ে বলেন, (হযরত যায়েদ হযরত ওমরের বড় ভাই ছিলেন) আমার এই বর্ম পরে নাও। হযরত যায়েদ স্বল্পক্ষণের জন্য সেই বর্ম পরিধান করেন। এরপর যুদ্ধের সময় খুলে ফেলেন। হযরত ওমর বর্ম খুলে ফেলার কারণ জিজ্ঞেস করলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, আমিও সেই শাহাদতের বাসনা রাখি যা আপনি কামনা করেন। আর তারা উভয়েই বর্ম রেখে দেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বিদায় হজের সময় মহানবী (সা.) বলেন, নিজেদের দাসদের প্রতি যত্নবান থাকবে। দাসদের প্রতি যত্নবান থাকবে। তোমরা যা খাও তা থেকেই তাদের খাওয়াও। আর তোমরা নিজেরা যা পরিধান কর তা থেকেই তাদের পরিধান করাও। আর তোমরা ক্ষমা করতে চাও না এমন কোন ভুল যদি তাদের দ্বারা হয়ে যায়- তাহলে হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তাদেরকে বিক্রি করে দিও, শাস্তি দিও না। ইয়ামামার যুদ্ধে যখন মুসলমানদের পদস্খলন হয়, হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব উচ্চস্বরে এই দোয়া আরম্ভ করেন যে, হে আল্লাহ্! আমার সাথিদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর মুসায়লামা কাযযাব এবং মাহাকামা বিন তোফায়েল যে কাজ করেছে, আমি তোমার সামনে তা থেকে দায়মুক্তির ঘোষণা দিচ্ছি। এরপর পতাকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে শত্রুর সারিতে এগিয়ে গিয়ে নিজের তরবারি পরিচালনার দক্ষতা প্রদর্শন করতে থাকেন , যতক্ষণ না তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত যায়েদের শাহাদতের পর হযরত উমর বলেন খোদা যায়েদকে করুণাসিক্ত করুন। দুটো পুণ্যে আমার ভাই আমার চেয়ে এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ ইসলামও আমার পূর্বে গ্রহণ করেছে আর শহীদও আমার পূর্বে হয়েছে।

(আলা আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, লি ইবনে হাজার, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫০০)

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হযরত ওমর যখন মুতাম্মাম বিন নুওয়াইরাকে তার ভাই মালেক বিন নুওয়াইরার স্মরণে শোকগাথা গাইতে শুনেন, তখন তিনি বলেন, যদি আমিও তোমার মতো ভালো কবিতা গাইতে পারতাম তাহলে আমিও আমার ভাই যায়েদের স্মরণে এমন শোকগাথাই শুনাতাম যেমনটি তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য গেয়েছ। তখন মুতাম্মাম বলেন, যদি আমার ভাইও এভাবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতেন তাহলে আমি দুঃখভারাক্রান্ত হতাম না। তখন হযরত ওমর বলেন আজ পর্যন্ত আর কেউ আমার প্রতি সেভাবে সমবেদনা প্রকাশ করে নি যেভাবে তুমি করেছ।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫৩)

এই ঘটনার আরো একটি বিশদ বিবরণ রেওয়ায়েতে দেখা যায় যে, হযরত ওমর হযরত মুতাম্মাম বিন নুয়ায়রাকে বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য কতইনা দুখভারাক্রান্ত! তখন তিনি তার এক চোখের দিকে ইশারা করে বলেন, আমার এই চোখ এই দুঃখের আতিশয্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি আমার ভালো চোখেও এত কেঁদেছি যে, অশ্রু বিসর্জন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার নষ্ট চোখও এর সাহায্য করেছে। হযরত ওমর বলেন, এটি এমন গভীর বেদনা যে, নিজের প্রয়াত আত্মীয়ের জন্য হয়তো কেউ এমন দুঃখ প্রকাশ করেনি। এরপর হযরত ওমর বলেন, আল্লাহ্ যায়েদ বিন খাত্তাবের প্রতি দয়ার্দ্র হন। আমি যদি কবিতা লেখার সামর্থ্য রাখতাম তাহলে আমিও হযরত যায়েদের বিয়োগে সেভাবেই ক্রন্দন করতাম যেভাবে তুমি ক্রন্দন করছ। হযরত মুতাম্মেম বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আমার ভাই ইয়ামামার যুদ্ধে সেভাবেই শহীদ হতেন যেভাবে আপনার ভাই শহীদ হয়েছেন তাহলে আমি কখনো তার জন্য অশ্রু বিসর্জন করতাম না। এ কথা হযরত ওমরের হৃদয়ে রেখাপাত করে আর তিনি নিজ ভাই সম্পর্কে আশ্বস্ত হন। অথচ হযরত ওমর ভ্রাতৃবিয়োগে গভীরভাবে মর্মাহত ছিলেন। তিনি বলতেন যে, যখন প্রভাত সমীরণ প্রবাহিত হয় তা আমার কাছে যায়েদের সৌরভ নিয়ে আসে।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

মুসায়লামা কাযযাবের সাথীদের মধ্য থেকে রিজ্জাল বিন উনফুয়া হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবের হাতেই নিহত হন। এক রেওয়ায়েতে রিজ্জাল বিন উনফুয়ার নাম নাহারও উল্লিখিত আছে। সে ছিল সেই ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, হিজরত করেছিল আর কুরআনের ক্বারীও ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসায়লামার দলে যোগ দিয়েছিল। (তাই আমাদের সবসময় শুভ পরিণতির জন্য দোয়া করা উচিত)। সে তাকে বলে যে, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে শুনেছি যে, তিনি তোমাকে নবুয়্যতে অংশীদার করেছেন। বনু হুনায়ফার জন্য এটি সবচেয়ে বড় ফিতনা ছিল। হযরত আবু হুরায়রার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি মহানবী (সা.) এর সকাশে একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বসেছিলাম। আমাদের সাথে রিজ্জাল বিন উনফুয়াও ছিলেন। তিনি বলেন, তোমাদের মাঝে এক ব্যক্তি রয়েছে যার মাড়ির দাঁত ওহুদসম অগ্নিতে জ্বলবে, অর্থাৎ সে অগ্নিতে থাকবে। সে এক জাতিকে পথভ্রষ্ট করবে। তারপর আমি এবং রিজ্জাল বিন উনফুয়া রয়ে যাই। এ বিষয়ে আমি সবসময় ভীত-ত্রস্ত থাকতাম। এক পর্যায়ে রিজ্জাল বিন উনফুয়া মুসায়লামা কায্যাবের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। আর সে তার নবুয়্যতেরপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই রিজ্জাল বিন উনফুয়া ইয়ামামার যুদ্ধে নিহত হয় আর হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব তাকে হত্যা করেন।

(আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৫১-৫৫২)

হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবকে আবু মরিয়ম আল হানাফী শহীদ করে। আবু মরিয়মের ইসলাম গ্রহণের পর একবার হযরত ওমর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি যায়েদকে শহীদ করেছ? সে বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন আল্লাহ্ হযরত যায়েদকে আমার হাতে সম্মানিত করেছেন। আর আমাকে তার হাতে লাঞ্ছিত করেননি। হযরত ওমর আবু মরিয়মকে বলেন যে, সেদিন তোমার মতে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলমানরা তোমাদের কতজন যোদ্ধাকে হত্যা করে থাকবে? আবু মরিয়ম বলে, চৌদ্দশত বা ততোধিক। হযরত ওমর বলেন, এরা কতইনা ঘৃণ্য লাশ। আবু মরিয়ম বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে জীবিত রেখেছেন। এক পর্যায়ে আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করি যা তিনি তাঁর নবী এবং মুসলমানদের জন্য পছন্দ করেছেন। হযরত ওমর আবু মরিয়মের এই কথায় খুবই প্রীত হন। আবু মরিয়ম পরবর্তীতে বসরার কাজী বা প্রধান বিচারপতিও নিযুক্ত হন।

ইমামের বাণী

দুনিয়াতে এক সতর্ককারী এসেছে। দুনিয়া তাকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।" (ফতেহ ইসলাম, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া
আমাইপুর, বীরভূম

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮৮-২৮৯) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৮-২৮৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

পরবর্তী সাহাবী, যার স্মৃতিচারণ হবে, তার নাম হলো হযরত উবাদা বিন খাশখাশ। ওয়াকিদি হযরত উবাদা বিন খাশখাশের নাম আবদা বিন হাস্‌সাস উল্লেখ করেছেন। আর ইবনে মান্দা তার নাম উবাদা বিন খাশখাশ আম্বরী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাহোক তার সম্পর্ক ছিল বাললি গোত্রের সাথে। তিনি হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদের চাচাতো ভাই ছিলেন। আর তার বৈমাতৃক ভাইও ছিলেন। বনু সালেমের মিত্র ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৩)

হযরত উবাদা বিন খাশখাশ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বদরের যুদ্ধে কায়েস বিন সায়েবকে বন্দি করেন। হযরত উবাদা বিন খাশখাশ ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তাকে হযরত নু'মান বিন মালেক এবং মুজাযযের বিন যিয়াদের সাথে একই কবরে সমাহিত করা হয়।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৭ ও ৫১৩)

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ। তার পিতার নাম ছিল জাদ বিন কায়েস এবং ডাক নাম ছিল আবু ওয়াহাব। তার সম্পর্ক ছিল বনু সালামা গোত্রের সাথে, যা আনসারদের একটি গোত্র ছিল। হযরত মুআয বিন জাবাল মায়ের দিক থেকে তার বৈমাতৃক ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৯৬)

তবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদের পিতা আবু ওয়াহাবকে বলেন, হে আবু ওয়াহাব! তুমি কি আমাদের সাথে এ বছর যুদ্ধে যাবে? আবু ওয়াহাব বলে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। আমি যেতে পারবো না, সে মহানবী (সা.) এর সামনে হাস্যকর অজুহাত প্রদর্শন করে আর বলে, আমার জাতি জানে যে, আমি গভীরভাবে নারীদের প্রতি আসক্ত। আমি যখন বনু আসফার অর্থাৎ রোমান নারীদের দেখব তখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। মহানবী (সা.) তাকে উপেক্ষা করে অনুমতি প্রদান করেন। ঠিক আছে, অজুহাত দেখাচ্ছ, অবকাশ দেন যে, যেও না। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাদ এই কথা অবগত হওয়ার পর নিজ পিতার কাছে আসেন আর পিতাকে বলেন, আপনি মহানবী (সা.) এর কথা কেন অমান্য করলেন। খোদার কসম আপনি বনু সালামার সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি, আজই সুযোগ, এতে যোগদান করুন। অথচ আপনি নিজেও যুদ্ধের জন্য বের হন না আর কাউকে বাহনও সরবরাহ করেন না। এখন ছেলের সামনে আরো একটি অজুহাত দেখাচ্ছে, আর এটিই সত্য কথা, তিনি বলেন, হে আমার পুত্র! আমি কেন এই দাবদাহ এবং কষ্টদায়ক মৌসুমে বনু আসফারের উদ্দেশ্যে বের হব। আল্লাহ্‌র কসম, আমি তো খুরবা (অর্থাৎ যেখানে বনু সালামার বসতি ছিল) স্থিত নিজ গৃহেও নিজেকে তাদের ভয় থেকে নিরাপদ মনে করি না। রোমানদের ভয়ে সে ভীত ছিল। এই ব্যক্তি কাপুরুষ ছিল। আমি কি তাদের এলাকায় যাব আর রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। হে আমার পুত্র! খোদার কসম যুগের প্রবাহ সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবে অবহিত। আমি জানি পরিস্থিতি কি হয়ে থাকে। আজকে এক অবস্থা বিরাজ করে, আগামীকাল ভিন্ন অবস্থা। তার এসব কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ পিতার সাথে কঠোর আচরণ করেন এবং বলেন, খোদার কসম আপনার হৃদয়ে কপটতা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই মহানবী (সা.) এর ওপর আপনার সম্পর্কে কুরআনে (কোন আয়াত বা শিক্ষা) নাযেল করবেন যা সবাই পাঠ করবে। আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ করবেন যে, আপনি মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্‌র পিতা জুতা খুলে তার মুখে ছুড়ে মারে। আব্দুল্লাহ্ সেখান থেকে চলে যান, পিতার সাথে কোন কথা বলেন নি।

(কিতাবুল মাগাযি লিলওয়াকদি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮১)

উসুদুল গাবায় লেখা আছে যে, আব্দুল্লাহ্‌র পিতা জাদ বিন কায়েস সম্পর্কে মুনাফেক হওয়ার ধারণা ছিল। এই ব্যক্তি হুদায়বিয়ার সময় উপস্থিত ছিল। মানুষ যখন মহানবী (সা.) এর হাতে বয়আত করে তখনও এই ব্যক্তি বয়আত করে নি। বলা হয় যে, এই ব্যক্তি পরবর্তীতে তওবা করেছিল। আর তার মৃত্যু হয়েছে হযরত উসমানের খিলাফতকালে।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫২১)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত হারেস বিন অউস বিন মায। তিনি অউস গোত্রের সর্দার হযরত সাদ বিন মাযের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন। তার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ২৮ বছর বয়সে ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন, কিন্তু কতক অন্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন নি। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন আমি ওহুদের যুদ্ধের সময় মানুষের পদাঙ্ক অনুসরণে বের হই। আমি আমার পিছনে পায়ের শব্দ শুনি। ফিরে দেখি হযরত সাদ বিন মায। আর সাথে ছিল তার ভাইপো হযরত হারেস বিন অউস, যার হাতে বর্ম ছিল। এই রেওয়ায়েত এই কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, তিনি ওহুদের পরও জীবিত ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮৯) (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৫৬, হাদীস আয়েশা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হযরত হারেস সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি সেসব মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা কাব বিন আশরাফকে হত্যা করেছে। এই অভিযানকালে তার পায়ে আঘাত লাগে। রক্ত ঝরতে থাকে। সাহাবীরা তাকে উঠিয়ে মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৩৭) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

কাব বিন আশরাফ সেই ব্যক্তি ছিল, যে মদীনার সর্দারদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানবী (সা.) এর সাথে চুক্তির অংশীদার ছিল। কিন্তু পরে সে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। তাই মহানবী (সা.) তাকে হত্যার নির্দেশ জারী করেন। এই অভিযানকালে সাহাবীর আহত হওয়া সংক্রান্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ উমদাতুল ক্বারী-র ব্যাখ্যায় যেভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহলো, মুহাম্মদ বিন মাসলামা তার সাথিদের নিয়ে যখন কাব বিন আশরাফের ওপর হামলা করেন এবং তাকে হত্যা করেন, তখন তাদের এক সাথি হারেস বিন অউসের শরীরে তরবারির খোঁচা লাগে এবং তিনি আহত হন। অর্থাৎ সাথিদের তরবারির খোঁচায় তিনি আহত হন। তার সাথিরা তাকে নিয়ে দ্রুত মদীনায় পৌঁছেন আর মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হন। মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন অউসের ক্ষতস্থানে তার পবিত্র লালা লাগিয়ে দেন। এরপর তার আর কোন কষ্ট হয়নি। (উমদাতুল কারী, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৭৯, কিতাবুল মাগাযি)

কাব বিন আশরাফকে কেন হত্যা করা হয়েছে এ সংক্রান্ত ঘটনার বিবরণ কিছুটা আমি পূর্বেও তুলে ধরেছিলাম। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এর বিস্তারিত লিখেছেন, তা এখন বর্ণনা করছি। (যদিও কিছু পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছিল)। কাব বিন আশরাফ ইহুদী ধর্মের অনুসারী ছিল। কিন্তু জাতিগত দিক থেকে ইহুদী ছিল না, বরং আরব ছিল। তার পিতা আশরাফ বনু নাবহানের এক ধূর্ত ও চালাক ব্যক্তি ছিল, যে মদীনায় এসে বনু নযিরের সাথে সম্পর্ক এবং মিত্রতা গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে সে অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতাপশালী হয়ে উঠে আর ক্ষমতা হস্তগত করে ফেলে, এতটাই যে, বনু নযির গোত্রের বড় নেতা আবু রাফে বিন হুকায়েক তার কাছে নিজের মেয়ে বিয়ে দেয়। সেই মেয়ের গর্ভেই কাবের জন্ম হয়, যে বড় হয়ে নিজ পিতার চেয়েও বড় মর্যাদা অর্জন করে। অবশেষে তার যে পদমর্যাদা লাভ হয়,তাহলো, পুরো আরবের ইহুদীরা তাকে নিজেদের নেতা গণ্য করা আরম্ভ করে। কাব একজন সুদর্শন পুরুষ হওয়ার পাশাপাশি এক বাগ্মী বক্তাও ছিল। একইসাথে সে কবিও ছিল এবং প্রভূত সম্পদেরও অধিকারী ছিল। স্বজাতির আলেম শ্রেণি এবং অন্যান্য প্রভাবশালী লোকদেরকে দান-দক্ষিণার মাধ্যমে হাতের মুঠোয় রাখতো। কিন্তু চারিত্রিক দিক থেকে খুবই নোংরা চরিত্রের মানুষ ছিল। গোপন ষড়যন্ত্র এবং প্ররোরিত করার কাজে সে চরম দক্ষতা রাখতো।

মহানবী (সা.) এর মদীনায় হিজরতের পর অন্যান্য ইহুদীর সাথে কাব বিন আশরাফও সেই সন্ধির অংশীদার হয়। তিনি (রা.) এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু আমি সংক্ষেপে তার কোন কোন স্থান থেকে নিয়ে বর্ণনা করব। যাহোক সে সেই সন্ধির অংশীদার হয় যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা এবং যৌথ প্রতিরক্ষা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কাবের হৃদয়ে শত্রুতা ও বিদ্বেষের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। সন্ধির অংশীদার হয়েছে

ঠিকই, কিন্তু তার হৃদয়ে ব্যাধি ছিল, কপটতা ছিল, শত্রুতা এবং হিংসা ও বিদ্বেষ ছিল, আর এই কারণে সে মনের আগুনে পুড়ছিল। আর এই হিংসা ও বিদ্বেষের কারণে সে গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং দুরভিসন্ধির মাধ্যমে ইসলাম এবং মহানবী (সা.) এর বিরোধিতা আরম্ভ করে। যেমন লিখিত আছে যে, কাব প্রত্যেক বছর ইহুদী আলেম-মাশায়েখদের অনেক সদকা-খয়রাত করতো, কিন্তু মহানবী (সা.) এর হিজরতের পর যখন এরা তাদের বার্ষিক ওজীফা বা ভাতা নেওয়ার জন্য তার কাছে যায় তখন সে কথায় কথায় মহানবী (সা.) এর বিষয়টি উল্লেখ করে আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থের ভিত্তিতে এই ব্যক্তির সত্যাসত্য সম্পর্কে তোমাদের কী মতামত? তারা বলে, বাহ্যত তাকে সেই নবী বলেই মনে হয় যার প্রতিশ্রুতি আমাদের দেওয়া হয়েছে। এই উত্তর শুনে কাব জ্বলে উঠে, যে পূর্বেই হিংসা ও বিদ্বেষে জ্বলছিল। সে তাদেরকে কঠোর ভর্ৎসনা করে, আর যে দান বা ভাতা তাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিল, তা তাদেরকে দেয়নি। ইহুদী আলেমদের আয় রোজগার যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন তারা স্বল্পকাল পর পুনরায় কাবের দ্বারে গিয়ে বলে যে, লক্ষণাবলী বুঝতে আমাদের ভুল হয়েছে। আমরা চিন্তা করেছি, সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ (সা.) সেই নবী নন যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যাহোক, এই উত্তরে কাবের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ হয়েছে, আর তাদেরও লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে। সে তাদেরকে সদকা-খয়রাত দিয়ে দেয়। যাহোক এ এক ধর্মীয় বিরোধিতা ছিল। হযরত মিয়া বশীর আহমদ সাহেব যথার্থ লিখেছেন যে, এটি ধর্মীয় বিরোধিতা ছিল আর এই ধর্মীয় বিরোধিতা বড় কোন আপত্তির বিষয় নয়, যে কারণে চরম কোন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বা কাবকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। আসল বিষয় হলো এরপর কাবের শত্রুতা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। অবশেষে বদরের যুদ্ধের পর তা এমন রূপ ধারণ করে যা ছিল চরম নৈরাজ্যকর এবং বিস্ফোরন্মুখ, আর মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতির অবতারণা হয়। পূর্বে কাব মনে করতো মুসলমানদের এই যে ঈমানী উচ্ছাস ও উদ্দীপনা, সাময়িক, তা উবে যাবে এবং নিজেদের ধর্মের দিকে এরা ফিরে আসবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যখন অভাবনীয় সাফল্য লাভ হয় আর অধিকাংশ কুরায়েশ সরদার নিহত হয়, তখন সে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে। সে নিজের সমূহ চেষ্টা-প্রচেষ্টা সহকারে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। তার অন্তরে লালিত হিংসা বিদ্বেষের সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ হয় বদরের যুদ্ধে। লোকেরা এসে বলে, মক্কার অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমরা বিজয় লাভ করেছি। প্রত্যুত্তরে সে বলে, এগুলো সব মিথ্যা কথা, এটি একটি গুজব। যাহোক এই খবর যখন সত্য প্রমাণিত হয় আর যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এই খবর সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর সে আরো বেশি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে। বিজয়ের পর মুসলমানরা যখন ফিরে আসে তখন সে মক্কায় যায়। সেখানে গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে তার চাটুকারিতা, বক্তৃতা আর কবিতার মাধ্যমে কুরায়েশের হৃদয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আরো ঘৃতাহুতি দেয় এবং এই আগুন আরো ছড়ানোর চেষ্টা করে। আর তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের সীমাহীন পিপাসা জাগিয়ে তোলে। তাদের হৃদয়ে ভয়াবহ প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দেয়। যখন কাবের উস্কানিতে তাদের চিন্তাধারায় চরম উত্তেজনা সঞ্চার হয়, সে তাদেরকে কাবা-চত্তরে নিয়ে গিয়ে কাবা শরীফের পর্দা তাদের হাতে ধরিয়ে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নেয় যে, যতদিন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.) কে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করবে ততদিন তারা স্বস্তির শ্বাস গ্রহণ করবে না। বলা হয়, তার কথায় মক্কায় আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরপর সে অন্যান্য জাতির কাছে যায় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তোলে। মুসলমান মহিলাদের সম্পর্কেও অপলাপ করে। অর্থাৎ তার উত্তেজনাকর কবিতায় অত্যন্ত কদর্যপূর্ণ এবং অশ্লীল ভাষায় মুসলমান নারীদের কথা উল্লেখ করে। এমনকি নবী পরিবারের নারীদেরকেও এসব অশালীন কবিতার লক্ষ্যে পরিণত করে। আর তার কবিতা সর্বত্র প্রচার করে বেড়ায়। আর তার পরম অপরাধ হলো সে মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র রচনা করে। আর কোন নিমন্ত্রণাদির অজুহাতে নিজ গৃহে তাঁকে (সা.) ডেকে কয়েকজন ইহুদী যুবকের হাতে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যথাসময়ে খবর প্রকাশ পেয়ে যায়। এই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি।

আর বিষয় যখন এ পর্যন্ত গড়ায় এবং কাবের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গ, বিদ্রোহ, যুদ্ধের উস্কানি, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথাবার্তা ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সার্বিকভাবে প্রমাণ হয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.), যিনি সেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাক্ষরিত সন্ধির নিরিখে, যা তার মদীনায় আগমনের পর মদীনাবাসীদের মাঝে সম্পাদিত হয়েছিল, অর্থাৎ যখন মদীনায় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর তিনি (সা.) যার প্রধান এবং সর্বোচ্চ শাসক স্বীকৃত হন, তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, কাব বিন আশরাফ তার কুকীর্তির কারণে হত্যাযোগ্য। আর নিজ সাথিদেরকে তিনি (সা.) বলেন যে, তাকে হত্যা করা হোক। কিন্তু তখন যেহেতু কাবের নৈরাজ্যের কারণে মদীনার পরিবেশ এমন ছিল যে, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে যদি তাকে তখন হত্যা করা হতো তাহলে মদীনায় গৃহযুদ্ধ দেখা দেওয়ার আর অবর্ণনীয় রক্তপাত ও প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। এ কারণে মহানবী (সা.) এই যুদ্ধ, অশান্তি এবং রক্তপাত এড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেন যে, তাকে গোপনে হত্যা করা হোক। এই কাজের দায়িত্ব তিনি (সা.) অউস গোত্রের এক নিবেদিত প্রাণ সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামার ওপর ন্যাস্ত করেন। একইসাথে তাকে এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশও দেন যে, যে পন্থাই অবলম্বন কর, অউস গোত্রের নেতা সাদ বিন মাযের পরামর্শক্রমে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! নীরবে হত্যার জন্য তো কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যার মাধ্যমে কাবকে তার ঘর থেকে বের করে হত্যা করা সম্ভব হবে। যাহোক মহানবী (সা.) নীরব থাকেন এবং বলেন, ঠিক আছে, যে পন্থাই অবলম্বন করতে চাও কর। মুহাম্মদ বিন মাসলামা সাদ বিন মাযের পরামর্শক্রমে আবু নায়েলা এবং আরো দুই-তিন জন সাহাবীকে সাথে নেন এবং কাবের ঘরে পৌঁছান, আর তাকে বলেন যে, আমাদের সাহেব অর্থাৎ মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন। আজকাল যেহেতু আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা রয়েছে তাই তুমি কী আমাদেরকে কিছু ঋণ দিতে পার? এটি শুনে সে বড় আনন্দিত হয় আর বলে, সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে তাকে পরিত্যাগ করবে। মুহাম্মদ উত্তর দেন, তুমি যা-ই বল না কেন, আমরা তো মুহম্মদ (সা.) এর আনুগত্য স্বীকার করেছি। এখন আমরা দেখছি যে, এই জামা'তের পরিণতি কোথায় গিয়ে ঠেকে। তুমি কাজের কথা বল যে, ঋণ দেবে কিনা? কাব উত্তর দেয় যে, হ্যাঁ, ঋণ দেব। কিন্তু আমার কাছে কোন কিছু বন্ধক রাখ। তিনি বলেন কি বন্ধক রাখব। সেই হতভাগা প্রথম কথা যা বলে তা হলো তোমাদের নারীদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখ। তোমার মত মানুষের কাছে নারীদের বন্ধক রাখতে হবে- এমন চিন্তায় তার মনে ভীষণ ক্রোধের উদ্রেক হয়। সে বলে যে, ঠিক আছে তাহলে তোমাদের ছেলেদের বন্ধক রাখ। তিনি বলেন যে, এটিও সম্ভব নয়। আমরা পুরো আরবের সমালোচনা সহ্য করতে পারবো না। যদি তুমি দয়া কর তাহলে তোমার কাছে আমরা আমাদের অস্ত্র বন্ধক রাখছি। কাব এতে সম্মত হয়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সাথিরা রাতে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যান। রাত নামতেই তারা প্রকাশ্যে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে আসেন। তাকে ঘর থেকে বাইরে ডেকে আনেন এবং কাবু করে ফেলেন। এরপর তারা তাকে হত্যা করেন। যায়েদের কথা হচ্ছিল,কাবকে হত্যা করার সময় তিনি আহত হয়েছিলেন, নিজ সাথিদের তরবারির খোঁচা লাগে। তারা তাকে হত্যা করার পর মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হয়ে এই হত্যার সংবাদ দেন।

প্রভাতে তার নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে উত্তেজনা দেখা দেয় আর সব ইহুদী উত্তেজিত হয়। পরের দিন সকালে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, আমাদের নেতা কাব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) অস্বীকার করেন নি আর এ কথাও বলেননি যে, আমি জানি না বা বলেন নি যে, এমন কিছু ঘটে নি। বরং তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি জান কাব কোন কোন অপরাধ করেছে? এরপর তিনি সংক্ষেপে কাবের চুক্তিভঙ্গ করা, যুদ্ধে প্ররোচিত করা,নৈরাজ্য ছড়ানো, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি গতিবিধির কথা স্মরণ করান, যা শুনে তারা তারা ভয় পেয়ে নিরুত্তর থাকে। আর তাদের উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে যায়। তারা বুঝতে পারে যে, হ্যাঁ, কথা তো সত্য, এর শাস্তি এটিই হওয়া উচিত ছিল। এরপর মহনবী (সা.) তাদেরকে বলেন, অন্তত পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য শান্তি ও সহযোগিতার লক্ষ্যে চুক্তিবদ্ধ হও। আর শত্রুতা এবং নৈরাজ্য এবং অশান্তির ছড়িয়ো না। তখন ইহুদীদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস আর ফিতনা ও নৈরাজ্য এড়িয়ে চলার নতুনভাবে অঙ্গীকার করে। আর এই চুক্তিপত্র হযরত আলীর হাতে ন্যস্ত করা হয়। পরবর্তীতে ইহুদীরা কাব বিন আশরাফের হত্যার কথা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে অভিযুক্ত করেছে বলে ইতিহাসে কোথাও উল্লেখ নেই। কেননা তাদের মন বলতো যে, কাব তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ পরবর্তীতে এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, মহানবী (সা.) একটি আইন

বহির্ভূত হত্যা পরিচালনা করেছেন। এটি আন্যায় কাজ ছিল। তিনি (রা.) লিখেন যে, এটি অবৈধ হত্যা ছিল না, কেননা কাব বিন আশরাফ মহানবী (সা.) এর সাথে যথারীতি শান্তিচুক্তি করেছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, বরং সে অঙ্গীকার করেছিল যে, সকল বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করবে আর মুসলমানদের সাথে মিত্রতা রাখবে। এই চুক্তি অনুসারে সে এই কথাও শিরোধার্য করেছিল যে, মদিনায় যে ধরণের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, সেই সরকারের প্রধান হবেন মহানবী (সা.), আর সকল প্রকার ঝগড়া, বিবাদ ও মতানৈক্যের পরিস্থিতিতে তাঁর (সা.) সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করা সবার জন্য আবশ্যক হবে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, এই চুক্তি অনুসারেই ইহুদীরা তাদের মামলা-মোকদ্দমা মহানবী (সা.) এর সামনে উপস্থাপন করতো আর তিনি তাদের মাঝে রায় এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। এসব বাস্তবতা সত্ত্বেও কাব সকল চুক্তি ও অঙ্গীকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে এবং উপেক্ষা করেছে। আর মুসলমানদের সাথে বরং বলতে হবে তদানীন্তন শাসকের প্রতি বিশাস ঘাতকতা প্রদর্শন করেছে। এটি নিছক মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন নয়, এখানে সে তৎকালীন শাসকের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, কেননা মহানবী (সা.) তখন সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন। সে মদীনায় ফিতনা এবং নৈরাজ্যের বীজ বপন করে, আর দেশে যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার অপচেষ্টা করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আরব গোত্রকে ভয়াবহভাবে উস্কে দেয়, মুসলমানদের নারীদের বিরুদ্ধে তার উত্তেজনাপূর্ণ কবিতায় অপলাপ করে, মহানবী (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আর এসব সে এমন পরিস্থিতিতে করে, যখন মুসলমানরা, যারা পূর্বেই চতুর্মুখী সমস্যায় জর্জরিত ছিল, তাদের জন্য চরম কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । এমতাবস্থায় কাবের অপরাধ, বরং বহুবিধ অপরাধ এমন ছিল না যার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার কোন কারণ ছিল বা পদক্ষেপ না নেওয়ার মতো যুক্তিযুক্ত কোন কারণ ছিল না। অতএব এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহবে লিখেন যে, বর্তমানের তথাকথিত সভ্য দেশগুলোতেও বিদ্রোহ, চুক্তি ভঙ্গ, যুদ্ধর প্ররোচনা আর হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্য অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাই আপত্তি কিসের?

দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয় হত্যার রীতি সম্পর্কে, অর্থাৎ প্রশ্ন করা হয় যে, তাকে গোপনে কেন হত্যা করা হলো? এ সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত যে, আরবে তখন রীতিমত কোন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যদিও তারা একজন রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করেছিল, তিনি সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন ঠিকই, কিন্তু একই সাথে স্ব-স্ব সিদ্ধান্ত করতে চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক গোত্র স্বাধীনও ছিল এবং স্বায়ত্বশাসিতও ছিল। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের জন্য তারা মহানবী (সা.) এর কাছে আসতো। কিন্তু বিভিন্ন গোত্র নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে তাও করতে পারতো। এমন পরিস্থিতিতে সেই আদালত কোনটি ছিল যেখানে কাবের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত হত্যার রায় আদায় করা সম্ভব হতো? ইহুদীদের কাছে কি অভিযোগ করা হতো যাদের কি না সে নেতা ছিল? আর তারা স্বয়ং ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং প্রায় সময় নৈরাজ্য সৃষ্টি করতো? অতএব ইহুদীদের কাছে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। সোলাইম ও গাতফান গোত্রের কাছেও সাহায্য চাওয়ার সুযোগ ছিল না যারা বিগত কয়েক মাসে মদীনায় অতর্কিত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল। সেটিও তাদেরই গোত্র ছিল। তাই স্পষ্টতই তাদের কাছেও কোন ন্যায়বিচার পাওয়া যেতো না। তিনি (রা.) বলেন, সে যুগের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করে দেখ যে, যখন এক ব্যক্তির উস্কানি ও যুদ্ধের ইন্ধন জোগানো, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও হত্যার ষড়যন্ত্র সমাজ ও দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হিসেবে তাকে হত্যা করা ছাড়া মুসলমানদের জন্য আর কোন্ পথ খোলা ছিল? কেননা অগণিত শান্তিপ্রিয় নাগরিকের জীবন ও দেশের শান্তি বিপন্ন হওয়ার পরিবর্তে এক দুষ্কৃতকারী ও নৈরাজ্যবাদী নিহত হওয়া শ্রেয়। আল্লাহ তা'লাও একথাই বলেন যে, ফিতনা নৈরাজ্য থেকে ভয়াবহ।

যাহোক, হিজরতের পর মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে স্বাক্ষরিত সেই চুক্তি অনুসারে মহানবী (সা.) এর মর্যাদা একজন সাধারণ নাগরিকের ছিল না, বরং তিনি সেই গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান স্বীকৃত হয়েছিলেন যা মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর সকল বিবাদ-বিষম্বাদ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে করেন তা জারী করার কর্তৃত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তিনি যদি দেশের শান্তির স্বার্থে কাবের নৈরাজ্যবাদিতার কারণে তাকে হত্যাযোগ্য বিবেচনা করে থাকেন তাহলে তা বড় কোন বিষয় ছিলনা। সুতরাং ১৩০০ বছর পর ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের আপত্তি একেবারই অযৌক্তিক, কেননা তখন ইহুদীরা তাঁর কথা শুনে কোন আপত্তি করে নি।

(মির্যা বশীর আহমদ এম.এর রচিত সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তক থেকে সংকলিত, পৃ: ৪৬৭-৪৭৩))

সত্যিকার অর্থে দীর্ঘকাল তারা কোন আপত্তি করে নি। অতএব এ ছিল তার অবস্থা। যাহোক, হযরত যায়েদের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাকে হত্যার অভিযানে যে দল প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনিও তার অংশ ছিলেন। আর ইসলাম ও মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে ধর্মীয় উগ্রতার যেসব অপবাদ আরোপিত হয়ে থাকে সেসব অপবাদও ভ্রান্ত ছিল। সে শাস্তিযোগ্য ছিল আর মহানবী(সা.) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাকে শাস্তি দিয়েছেন। আজ এই ঘটনার মাধ্যমেই শেষ করছি।

আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা ইসলামকেও এসব ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আজকাল মুসলমানদের অবস্থা এমনই। এসব পুরোনো কথা বা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে তারা নিজেরা ফিতনায় হাবুডুবু খাচ্ছে, নিজেরাই ফিতনার কারণ হচ্ছে। অন্যান্য দেশের সাথেও তারা কলহে লিপ্ত। আর বিভিন্ন মুসলমান সরকার নিজেরাও। আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে এসব ফিতনা থেকে রক্ষা করুন আর এ যুগে খোদা প্রেরীত হেদায়েতদাতাকে গ্রহণ করার তৌফীক দিন যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আগমনণ করেছেন।

*****❖*****❖*****❖*****

এগুলি খরিদ করিতে চায়।" ১ম পাতার শেষাংশ.....

যীশু-ইবনে-মরিয়মের প্রার্থনা

{উভয়ের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক}

তিনি বলিয়াছেন ঃ-

"হে প্রভু! যে বিষয় আমি মন্দ মনে করি; তাহার উপর জয়ী হইবার ক্ষমতা আমার নাই। সেই পুণ্য আমি অর্জন করিতে পারি নাই, যাহা অর্জন করার আমার আকাঙ্খা ছিল। অন্যান্য লোক তাহাদের পুরস্কার তাহাদের হাতে পাইয়াছে, আমি পাই নাই, কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠত্ব আমার কার্যে। আমার চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট অবস্থায় আর কেহই নাই। হে প্রভু! তুমি সর্বাপেক্ষা উচ্চ। তুমি আমার পাপ ক্ষমা কর। হে প্রভু! আমি যেন আমার শত্রুগণের জন্য অভিযোগের কারণ না হই, এবং আমার বন্ধুগণের দৃষ্টিতেও আমাকে হেয় করিও না। এরূপ যেন না হয় যে, আমার তাকওয়া (ধর্মপরায়ণতা) আমাকে বিপদে পতিত করে; এরূপ যেন না হয় যে, এই দুনিয়াই আমার সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের স্থান হয়, কিম্বা সর্বাপেক্ষা বড় মকসুদ (উদ্দেশ্যের বস্তু) হয়। এরূপ ব্যক্তি যেন আমার উপর কর্তৃত্ব লাভ না করে, যে আমার প্রতি রহম করিবে না। হে খোদা! তুমি বড় দয়ালু, নিজ দয়াগুণে তুমি এরূপ কর। তুমি এরূপ সকল লোকের প্রতিই দয়া করিয়া থাক, যাহারা তোমার দয়ার ভিখারী।"

জনৈক ইহুদীও ইহার স্বীকৃতি দিয়াছেন যে, শ্রীনগরের উল্লিখিত সমাধি ইহুদী নবীগণের সমাধির প্রণালীতে নির্মিত হইয়াছে।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৭৯-৮১)

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা উভয় জগতের সফলতা অর্জনের এবং মানুষের হৃদয় জয় করার বাসনা রাখ, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে (গুণাবলী) দ্বারা সুসজ্জিত কর এবং অপরকে নিজ আদর্শের নমুনা দেখাও। অবশ্যই সফল হবে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

আল্লাহ্‌র বাণী

مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

"আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য না কোন বন্ধু আছে এবং না কোন সাহায্যকারী আছে।" (আল বাকারা: ১০৮)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

জুমআর খুতবা

“আমি খোদার নামে শপথ করে বলছি, নিজের স্ত্রী সম্পর্কে পুণ্য ছাড়া অন্য কোন বিষয় আমার জানা নেই।”

বদরী সাহাবী হযরত মিসতাহ বিন উসাসা (রা.) -এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আলোচনা।

‘ইফ্‌ক’-এর ঘটনার সন্তুষ্টিজনক ব্যাখ্যা ও আলোচনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৪ ডিসেম্বর , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৪ ফাতাহ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজকে হযরত মিসতা বিন উসাসার স্মৃতিচারণ হবে। তার নাম ছিল অউফ আর উপাধি ছিল মিসতা। তার মা ছিলেন হযরত উম্মে মিসতা সালমা বিন সাখার, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর খালা হযরত রায়েতা বিনতে সাখারের কন্যা ছিলেন।

(আল আসাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৪) (উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড ,পৃ: ১৫০) (ইসতিয়াব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৭২)

হযরত মিসতা বিন উসাসা হযরত উবায়দা বিন হারেস এবং তার দুই ভাই হযরত তোফায়েল বিন হারেস এবং হোসাইন বিন হারেসের সাথে মদীনা হিজরত করেন। সফরের পূর্বে সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা নাজেহ উপত্যকায় মিলিত হবেন। কিন্তু হযরত মিসতা বিন উসাসা পিছনে রয়ে যান, কেননা সফরকালে তাকে সর্প দংশন করে। যারা প্রথমে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তারা পরের দিন সংবাদ পান যে, হযরত মিসতাকে সাপ দংশন করেছে। তারা ফিরে আসেন এবং তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় চলে যান। মদীনায় তারা সকলে হযরত আব্দুর রহমান বিন সালামার ঘরে অবস্থান করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

মহানবী (সা.) হযরত মিসতা বিন আসাসা এবং যায়েদ বিন মুযাইয়্যেন এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। হযরত মিসতা বদরসহ বাকি সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত)

হিজরতের আট মাস পর মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসকে ষাটজন বা ভিন্ন রেওয়ায়েত অনুসারে আশিজন অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেসের জন্য একটি সাদা রঙের পতাকা বাঁধেন বা পতাকা বানান, যা হযরত মিসতা বিন উসাসা বহন করেন। এই সারিয়া অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরায়েশের বাণিজ্য কাফেলাকে পথে বাধাগ্রস্ত করা। এই কুরায়েশ কাফেলার আমীর ছিল আবু সুফিয়ান, কারো কারো মতে ইকরামা বিন আবু জাহল, আবার কারো কারো মতে হযরত মিকরায বিন হাফস তাদের নেতা ছিল। এই কাফেলার সদস্য সংখ্যা ছিল দুইশত, যারা বাণিজ্য পণ্য নিয়ে যাচ্ছিল। সাহাবীদের জামাত রাবেগ উপত্যকায় তাদের ধরে ফেলে। এই জায়গাকে ওয়াদদানও বলা হয়। এটি নিছক বাণিজ্য কাফেলা ছিল না বরং সমরাস্ত্রে সজ্জিত ছিল, এই ব্যবসায় যে আয় হতো তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহৃত হওয়ার কথা ছিল। ঘটনাপ্রবাহ থেকে অনুমান করা যায় যে, তাদের পুরো প্রস্তুতি ছিল। যাহোক তারা যখন সেখানে পৌঁছান তখন উভয় পক্ষের মাঝে তির আদান প্রদান ছাড়া আর কোন মোকাবেলা হয় নি। তারা যুদ্ধের জন্য যথারীতি সারিবদ্ধ হয় নি। পূর্বেও এক সাহাবীর প্রেক্ষাপটে এর উল্লেখ এসেছিল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে সাহাবী প্রথম তির নিক্ষেপ করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস। এটি প্রথম তির ছিল যা মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই ঘটনার সময় হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ এবং হযরত উয়াইনা বিন গাযওয়ান, মতান্তরে বা ইবনে হিশাম এবং তাবরীর ইতিহাস অনুসারে উতবা বিন গাযওয়ান মুশরেকদের দল থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হন কেননা তাদের উভয়ে পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হতে চাইছিলেন। হযরত উবায়দা বিন হারেসের নেতৃত্বে এটি ইসলামের দ্বিতীয় সারিয়া-অভিযান ছিল। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তির বিনিময়ের পর উভয় পক্ষ পশ্চাদপসরণ করে। মুশরেকরা মুসলমানদের দেখে এতটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা ধারণা করে, মুসলমানদের অনেক বড় সৈন্যবাহিনী রয়েছে যারা তাদের সাহায্য করতে পারে। তাই তারা ফিরে যায় আর মুসলমানরাও তাদের পিছু ধাওয়া করে নি।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৫-২১৬) (সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৯২) (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২)

কেননা যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। তাদেরকে বাধাগ্রস্ত করা ছিল উদ্দেশ্য। আর এই শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা যদি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় তাহলে মুসলমানরাও প্রস্তুত রয়েছে।

খায়বার এর অভিযানের সময় মহানবী (সা.) হযরত মিসতাকে এবং হযরত ইবনে ইলিয়াসকে পঞ্চাশ ওয়াসাক খাদ্যশস্য প্রদান করেন। সে যুগের রীতি অনুসারে ‘মালে গনিমত’ (যুদ্ধের পর পরিত্যক্ত সামগ্রী) দেওয়া হতো। আততাবাকাতুল কুবরায় এ কথাগুলো লিখিত আছে যে, হযরত উসমানের খিলাফতকালে ৩৪ হিজরীতে ৫৬ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে। এটিও বলা হয় যে, তিনি হযরত আলীর খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং হযরত আলীর সাথে সিফফিনের যুদ্ধে যোগদান করেন। আর সে বছরই ৩৭ হিজরীতে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত) (আল আসাবা ৬ ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৪)

হযরত মিসতা হলেন সেই ব্যক্তি যার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন হযরত আবু বকর (রা.)। অর্থাৎ তাঁর ওপর এই দায়িত্ব ছিল। কিন্তু হযরত আয়েশার ওপর যখন অপবাদ আরোপ করা হয় তখন হযরত মিসতাও অপবাদ আরোপকারীদের সাথে যোগ দেন। এতে হযরত আবু বকর (রা.) শপথ করেন যে, ভবিষ্যতে এর ভরণপোষণ আর করবেন না। তখন কুরআন শরীফে এই আয়াত নাযেল হয়-

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا۔ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (النور:23)

(সূরা নূর: ২৩)

অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা সাধ্য এবং সামর্থ্য রাখে তারা যেন নিকটাত্মীয়, মিসকিন এবং আল্লাহ্‌র পথে হিজরতকারীদের কিছু না দেওয়ার শপথ না করে। তাদের উচিত ক্ষমা এবং মার্জনা করা। তেমারা কি পছন্দ করবে না যে, আল্লাহ্ তা’লা তোমাদের ক্ষমা করুন। আর আল্লাহ্‌তা’লা অতীব ক্ষমাশীল বার বার দয়াকারী।

যাহোক এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার ফলে হযরত আবু বকর পুনরায় তার ভরণপোষণ দেওয়া আরম্ভ করেন। আল্লাহ্ তা’লা যখন হযরত আয়েশার নির্দোষ হওয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযেল করেন তখন অপবাদ আরোপকারীদের শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) হযরত আয়েশার ওপর অপবাদ আরোপকারী যেসব সাহাবীদের চাবুকাঘাত করিয়েছিলেন তাদের মাঝে হযরত মিসতাও ছিলেন।

(আল আসাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইফ্‌ক বা হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এটি যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা আর মুসলমানদের জন্য এতে শিক্ষাও রয়েছে তাই এ সম্পর্কে ব্যাপক লেখালেখিও হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা এ সম্পর্কে আয়াতও অবতীর্ণ করেছেন। যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়টিকে নিজের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত করেছেন যে, তিনি শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীকে তওবা ও ইস্তেগফার আর দোয়া ও সদকার মাধ্যমে বিলম্বিত করে দেন। অনুরূপভাবে মানুষকেও তিনি একই চরিত্রের শিক্ষা দিয়েছেন।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ঘটনার উল্লেখ করে ওয়াদা এবং ওয়াঈদের (অর্থাৎ পুরস্কার ও শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর) পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। পুনরায় তিনি বলেন, "কুরআন ও হাদীস থেকে যেভাবে প্রমাণিত যে, হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে মুনাফিকরা নিছক নোংরামিবশত যে অবাস্তব অপবাদ আরোপ করেছিল, সেই ঘটনায় কিছু অতি সরল সাহাবীও জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ফিতনা সৃষ্টি করা ছিল না। তারা সরলতাবশত এতে জড়িয়ে পড়েন। একজন সাহাবী এমন ছিলেন যিনি হযরত আবু বকর (রা.) এর ঘরে দু'বেলা রুটি খেতেন। তার এই ভুলের কারণে হযরত আবু বকর (রা.) শাস্তিস্বরূপ এই শপথ করেছিলেন যে, এই অন্যায় কাজের কারণে আমি আর কখনো তার ভরণপোষণ করবো না, তখন এই আয়াত নাযেল হয়-

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (সূরা নূর: ২৩)

তখন হযরত আবু বকর (রা.) তার এই শপথ ভঙ্গ করেন আর যথারীতি খাবার খাওয়ানো আরম্ভ করেন। এই ভিত্তিতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ইসলামী বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন যে, ইসলামী নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় হলো, শাস্তি প্রদান মূলক কোন অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা উত্তম চরিত্রের অন্তর্গত বিষয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়াঈদ কাকে বলে? কেউ যদি তার সেবক সম্পর্কে এই শপথ করে যে, আমি অবশ্যই তাকে পঞ্চাশবার জুতাপেটা করবো, তাহলে সেই ব্যক্তির অনুশোচনা ও আকুতিমিনতির কারণে তাকে ক্ষমা করা ইসলামী রীতি, যেন মানুষ খোদার রঙে রঙিন হতে পারে। কিন্তু ওয়াদার ব্যতিক্রম বৈধ নয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার দায়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কিন্তু শাস্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। "

(পরিশিষ্ট বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ১৮১)

ওয়াদা বা অঙ্গীকার সকল ভালোমন্দ দিক সামনে রেখে করা হয়ে থাকে, আর তা পালন করা আবশ্যক হয়ে থাকে। তা ভঙ্গ করলে জিজ্ঞাসাবাদও হবে বা কিছু জরিমানাও হবে।

বুখারী শরীফের রেওয়ায়েত অনুসারে ইফ্কের ঘটনার বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এই ঘটনার বিশদ বিবরণের একটি গুরুত্বও আছে, তাই আমি তা তুলে ধরছি, মহানবী (সা.) যখন কোন সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন আর যার নামে লটারি বের হতো তাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তিনি (সা.) তাঁর এক অভিযানে যাওয়ার প্রাক্কালে আমাদের মাঝে লটারি করেন, আমার নামে লটারি বের হয়। আমি তাঁর সাথে যাই। তখন পর্দা সংক্রান্ত নির্দেশ এসে গিয়েছিল। আমাকে হাওদায় বসানো হতো আর হাওদাসহ নামানো হতো। (উটের ওপর আরোহী বসানোর জন্য বানানো পর্দাবৃত বিশেষ জায়গাকে হাওদা বলা হয়।) আমরা এভাবেই সফররত ছিলাম। মহানবী (সা.) যখন তাঁর এই অভিযান শেষে ফিরতি সফরে ছিলেন তখন এক রাতে আমরা মদীনার অদূরেই ছিলাম। তিনি (সা.) যাত্রা করার নির্দেশ দেন। মানুষ যখন যাত্রার ঘোষণা দেয় আমিও যাত্রা করি আর বাহিনীকে পিছনে রেখে এগিয়ে যাই। তিনি বলেন যে, আমি পায়ে হেঁটেই যাত্রা করি। যখন আমি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে ফিরে আসি, অর্থাৎ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনে এক দিকে চলে যান। এরপর আমার হাওদার কাছে আসি আর আমার বক্ষে হাত দিয়ে দেখি যে, আমার যাফফারের কালো পাথরের মূল্যবান গলার হার খুলে পড়ে গেছে। একটি হার পরিহিতা ছিলেন, তা খুলে পড়ে যায়। আমি হার সন্ধানের জন্য ফিরে যাই আর এই সন্ধানে রত থাকি, সময় লেগে যায়। ততক্ষনে যারা আমার উট প্রস্তুত করতো, তারা আসে এবং সেই হাওদা উঠিয়ে উটের পিঠে সংস্থাপন করে যাতে আমি বসতাম। এটি খালি ছিল কিন্তু তারা অনুমান করে যে, আমি ভিতরেই আছি। তিনি বলেন, সে যুগে মহিলাদের ওজন কম হত, তাঁর ওজন খুব বেশি ভারি ছিল না। অর্থাৎ হযরত আয়েশা স্থুলকায় ছিলেন না। তিনি সামান্য পরিমাণ খাবারই খেতেন। মানুষ যখন হাওদা উঠায় তখন এর ওজনে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে নি। তাদের কাছে এটিকে হালকা মনে হয় নি। হযরত আয়েশা বলেন যে, তারা সেটি উঠিয়ে রেখে দেয়। আমি স্বল্পবয়স্কা মেয়ে ছিলাম। তারা উটকে উঠিয়ে চালনা আরম্ভ করে আর নিজেরাও যাত্রা করে। পুরো বাহিনী যখন চলে যায় ততক্ষণে আমি আমার হারও খুঁজে পেয়ে যাই। আমি আমাদের অবস্থানস্থলে ফিরে আসি। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। এরপর আমি সেই জায়গায় যাই যেখানে আমি অবস্থান করছিলাম। আমি ভাবলাম যে, তারা আমাকে না পেলে সেখানে ফিরে আসবে। আমি বসেছিলাম, ইত্যবসরে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

সাফওয়ান বিন মুআত্তাল সালামী যাকওয়ানী সৈন্যবাহিনীর পিছনে থাকতেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তি পিছনে থাকতো এটি দেখার জন্য যে, কাফেলা প্রস্থানের পর কোন জিনিস রয়ে যায় নি তো। তিনি বলেন, তিনি আমার অবস্থানস্থলে এসে এক ঘুমন্ত মানুষ দেখতে পান আর আমার কাছে আসেন। পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি এসে ইন্নালিল্লাহ্ পড়েন। তার ইন্না লিল্লাহ্ পড়ার শব্দ শুনে আমি জেগে উঠি। তিনি তার উটনী আমার কাছে নিয়ে আসেন এবং সেটিকে বসান। আমি সেই উটের উপর সওয়ার হই। তিনি উটের লাগাম ধরে পায়ে হাঁটতে থাকেন। তিনি বলেন, আমরা সৈন্যবাহিনীর সাথে যখন মিলিত হলাম, তখন তারা ঠিক দুপুরে বিশ্রামের জন্য যাত্রা বিরতি দিয়েছিলেন। এরপর যার ধ্বংস হওয়ার ছিল সে ধ্বংস হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই ঘটনাকে পুঁজি করে কেউ কেউ অপবাদ আরোপ করা আরম্ভ করে, বিভিন্ন অমূলক কথা হযরত আয়েশার প্রতি আরোপ করতে থাকে।

আর এই মিথ্যা অপবাদের হোতা ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল। আমরা মদীনায় পৌঁছি। সেখানে আমি এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। মানুষ অপবাদ আরোপকারীদের কথা বলাবলি করতে থাকে। এই অসুস্থতার সময় যে কথা আমার হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করত তাহলো-আমার প্রতি মহানবী (সা.) এর সেই স্নেহ দেখতাম না যা সচরাচর অসুস্থতার সময় আমি দেখে অভ্যস্ত ছিলাম। এই কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, অপবাদ আরোপ করা হয় আর কথা জানাজানি হয়। এই কথা মহানবী (সা.) এরও কর্ণগোচর হয়। অসুস্থতার সময় মহানবী (সা.)এর আমার প্রতি যে ব্যবহার ছিল তা পূর্বের মতো ছিল না। তিনি শুধু ভিতরে আসতেন, আসসালামু আলাইকুম বলতেন আর জিজ্ঞেস করতেন যে, সে কেমন আছে। এই অপবাদের কোন ধারণাই আমার ছিল না। এক পর্যায়ে আমি আরোগ্য লাভ করি কিন্তু চরম দুর্বলতা ছিল। এমতাবস্থায় একদিন আমি এবং উম্মে মিসতা মুনাসে-এর দিকে যাই, যা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জায়গা ছিল। আমরা রাতের বেলা বের হতাম। এটি আমাদের ঘরের পাশে শৌচাগার বানানোর পূর্বের কথা। সে যুগে মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বাইরে যেত। আর মহিলারা অন্ধকার নেমে আসার পর রাতের বেলা বাইরে যেতেন। তিনি বলেন,ইতিপূর্বে আমাদের অবস্থা আরবদের মতো ছিল যারা জঙ্গলে বা বাইরে গিয়ে প্রস্রাব-পায়খানা সারতো। আমি এবং উম্মে মিসতা বিনতে আবি রুহম যাচ্ছিলাম। তখন তার ওড়না আটকে যায় আর তিনি হোঁচট খান। তিনি বলেন, মিসতার দুর্ভাগ্য। আমি তাকে বললাম যে, কী বাজে কথা বলছো। তুমি কি এমন ব্যক্তিকে বাজে কথা বলছো যে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে! সে বললো হে সরলমতি মেয়ে! মানুষ যে অপবাদ আরোপ করছে, তুমি কি তা শোন নি? তখন সে আমাকে অপবাদ আরোপকারীদের কথা খুলে বলে যে, তোমার প্রতি এই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি সদ্য রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলাম। দুর্বলতা তো ছিল, কিন্তু এ কথা শুনে আমার রোগের কষ্ট বৃদ্ধি পায়।

ঘরে ফিরে আসার পর মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন, আমাকে আসসালামু আলাইকুম বলেন এবং জিজ্ঞেস করেন তুমি কেমন আছ? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি (রা.) বলেন, আমি তখন চাচ্ছিলাম যে, তাদের কাছে গিয়ে আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। অর্থাৎ এই যে, অপবাদ আরোপ করা হয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব। তিনি (সা.) আমাকে অনুমতি প্রদান করেন আমি আমার পিতামাতার কাছে আসি। আমি আমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম মানুষ কী গুজব ছড়াচ্ছে। আমার মা বলেন, হে আমার কন্যা!এই কারণে নিজের প্রাণকে সমস্যার মুখে ঠেলে দিও না, নিশ্চিন্ত থাক। আল্লাহ্‌র কসম, বিরলই এমনটি হয়ে থাকবে যে, কোন ব্যক্তির সুন্দরী স্ত্রী থাকবে, যাকে সে ভালোও বাসবে, আবার তার সতীনও থাকবে অথচ তার বিরুদ্ধে মানুষ গুজব ছড়াবে না। হযরত আয়েশা বলেন, আমি বললাম সুবহানাল্লাহ্। মানুষ এমন কথা বলাবলি করছে! পুনরায় তিনি বলেন, আমি সেই রাত এমনভাবে অতিবাহিত করি যে, প্রভাত পর্যন্ত আমার চোখের পানি থামে নি, এত বড় অপবাদ আমার প্রতি আরোপ করা হয়েছে! সারারাত আমার ঘুম

ইমামের বাণী

ইসলামের জীবন লাভ আমাদের নিকট হতে এক প্রায়শ্চিত্ত চায়। তা কী? তা হলো, এ পথে আমাদের মৃত্যুবরণ।

(ফতেহ ইসলাম, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি (আসাম)

আসেনি আর আমি কাঁদতে থাকি।

সকালে যখন উঠি মহানবী (সা.) আলী বিন আবি তালেব এবং ওসামা বিন যায়েদকে ডাকেন। সেই সময় যখন ওহীর অবতীর্ণ হতে বিলম্ব হয়, যাতে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা সম্পর্কে তাদের উভয়ের সাথে পরামর্শ করেন। অর্থাৎ এই অপবাদ দেওয়া হয়েছে, এখন তাকে রাখবো কি রাখবো না- এই পরামর্শ করার জন্য ডাকেন। মহানবী (সা.) এর নিজের স্ত্রীদের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল সেই ভালোবাসার ভিত্তিতে ওসামা পরামর্শ দেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা আপনার স্ত্রী। আল্লাহ্‌র কসম আমরা তাদের সম্পর্কে পুণ্য ছাড়া আর কিছু জানি না। তাদের কোন ত্রুটি আমরা দেখি নি। হযরত আয়েশা বলেন, আর আলী বিন আবি তালেব বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খোদা তা'লা আপনাকে কোন অভাবে রাখেন নি। হযরত আলী কিছুটা উগ্র স্বভাবের ছিলেন। তাই পরামর্শ দেন যে, আপনাকে আল্লাহ্ তা'লা কোন অভাবে রাখেন নি। তিনি ছাড়া আরো অনেক মহিলা রয়েছে। এরপর হযরত আলী বলেন, তার সেবিকাকে জিজ্ঞেস করুন, অর্থাৎ হযরত আয়েশার যে সেবিকা ছিল তাকে জিজ্ঞেস করুন যে, তিনি কেমন ছিলেন। সে আপনার সামনে সত্য কথা তুলে ধরবে। মহানবী (সা.) তখন তার সেবিকা বারীরাকে ডাকেন। তিনি বলেন, হে বারীরা! তুমি তার মাঝে, অর্থাৎ হযরত আয়েশার মাঝে, এমন কোন বিষয় দেখেছ কি যা তোমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে? বারীরা বলেন, আদৌ নয়।সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি হযরত আয়েশার ভেতর এর বেশি কিছু দেখি নি যাকে আমি তার দোষ মনে করতে পারি যে, তিনি স্বল্প বয়স্কা মেয়ে, আটা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন, অর্থাৎ কিছুটা উদাসীন। আর তার এত গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে যে, ঘরের ছাগল এসে আটা খেয়ে ফেলে। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি স্পষ্ট করেন যে, কোন পাপ তার ভেতর নেই কিন্তু এই দুর্বলতা রয়েছে যে, তার ওপর নিদ্রা ছেয়ে যায়। এটি শুনে মহানবী (সা.) সেদিন সাহাবীদের সম্বোধন করেন আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, কেননা সে-ই এই গুজব ছড়িয়েছিল। মহানবী (সা.) বলেন, এমন ব্যক্তিকে কে সামলাবে যে আমার স্ত্রীর বরাতে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি আল্লাহ্‌র কসম খাচ্ছি যে, আমার স্ত্রী সম্পর্কে পুণ্য ছাড়া আর কোন কিছুর অভিজ্ঞতা আমার নেই। আর তারা এমন ব্যক্তির কথা বলেছে যার সম্পর্কেও নেকী ছাড়া আমার আর কিছু জানা নেই। অর্থাৎ যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তার কথা হচ্ছে, তিনি যখন আমার ঘরে আসতেন তখন আমার সঙ্গেই আসতেন। এটি শুনে হযরত সাদ বিন মায দণ্ডায়মান হন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমি আপনার পক্ষ থেকে এর প্রতিশোধ নিব, যে এই অপবাদ আরোপ করেছে। যদি সে অউস গোত্রের হয় তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। আর যদি সে আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখে তাহলে আপনি যে নির্দেশ দেবেন আমরা তা পালন করব। তখন সাদ বিন উবাদা দাঁড়িয়ে যান, আর তিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন। তিনি ভালো মানুষই ছিলেন, কিন্তু জাতিগত আত্মাভিমান তাকে উত্তেজিত করে তোলে আর তিনি বলেন যে, তুমি ভুল বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি তাকে মারবে না আর এমন করার সামর্থ্যও তোমার নেই। বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। তখন উসায়েদ বিন হুযায়ের দাঁড়িয়ে যান,অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিও দাড়িয়ে যায়, আর তিনি বলেন, তুমি ভুল বলেছ। আল্লাহ্‌র কসম যে-ই এই অপবাদ আরোপ করেছে আমরা তাকে অবশ্যই হত্যা করব। এমনকি তিনি এ কথা বলে বসেন যে, তুমি তো মুনাফেক, তাই মুনাফেকদের পক্ষে ঝগড়া করছ। এতে অউস ও খাযরাজ উভয় গোত্র উত্তেজিত হয়ে উঠে, একে অপরের প্রতি ক্ষেপে যায়, রেগে যায়, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়, অর্থাৎ আরম্ভ হয়নি বরং আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়। মহানবী (সা.) মিম্বরে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি নিচে নেমে আসেন। তাদেরকে শান্ত করেন। তারা থেমে যায়। মহানবী (সা.)ও নিশ্চুপ হয়ে যান।

হযরত আয়েশা বলেন, (বুখারীর দীর্ঘ রেওয়ায়েত চলমান রয়েছে), আমি সারাাদিন কাঁদতে থাকি। আমার অশ্রুও থামতো না আর ঘুমও আসতো না। আমার পিতামাতা আমার কাছে এসে যান। দুই রাত এবং একদিন আমি এত কাঁদি যে, আমার আশঙ্কা হয়, এই ক্রন্দন আমার অন্তর বিদীর্ণ করে দিবে। আমি ধ্বংস হয়ে যাব বা আমি মারা যাব। তারা উভয়ে অর্থাৎ আমার পিতামাতা আমার কাছে বসেছিলেন আর আমি কাঁদছিলাম, এমন সময় এক আনসারী মহিলা ভেতরে আসার অনুমতি চায়। আমি তাকে অনুমতি প্রদান করি। সে-ও বসে আমার সাথে ক্রন্দনে যোগ দেয়। আমরা এই অবস্থাতেই ছিলাম, ঠিক তখনই মহানবী (সা.) ভিতরে আসেন এবং বসে পড়েন। হযরত আবু বকরের ঘরে আর যেদিন আমার ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি (সা.) আমার কাছে বসেন নি। সেদিন বসেছেন, এর পূর্বে বসেন নি, আমার খবরাখবর নিয়ে চলে যেতেন বা দাসীর কাছে খবরাখবর জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন, আর যখন বাবার বাড়ি চলে আসি তখন সেখানে জিজ্ঞেস করতেন। যাহোক তিনি বলেন, সেদিন আসেন আর আমার কাছে বসেন। তিনি এক মাস অপেক্ষমান ছিলেন। আমার সম্পর্কে তার প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। অর্থাৎ অপবাদ আরোপিত হওয়ার পর থেকে প্রায় এক মাস কেটে যায়, তিনি বসতেন না, কিন্তু সেদিন এসে বসেন। মহানবী (সা.) এই অপেক্ষায় ছিলেন যে, খোদা তা'লা কিছু প্রকাশ করবেন। হযরত আয়েশা বলেন, মহানবী (সা.) তাশাহুদ পড়েন এবং আমাকে বলেন যে, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এই কথা আমার কানে এসেছে, প্রথমবার মহানবী (সা.) হযরত আয়েশার সামনে এই কথাটি বলেন, তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই তা প্রকাশ করে দিবেন, আর যদি তোমার পক্ষ থেকে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর সন্নিধানে তওবা কর, কেননা বান্দা যখন নিজের পাপ স্বীকার করে এবং এরপর অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ্‌ও তার প্রতি দয়াদ্র হন। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন কথা শেষ করেন তখন আমার চোখের পানি শুকিয়ে যায়, আর আমিচোখে বিন্দুমাত্র অশ্রু অনুভব করিনি। ইতিপূর্বে আমি যেহেতু অনবরত কাঁদছিলাম, তাই আমার অশ্রু শুকিয়ে গিয়েছিল।

আমি আমার পিতাকে বললাম, অর্থাৎ হযরত আয়েশা হযরত আবু বকরকে বলেন যে, আপনি মহানবী (সা.)-কে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম, আমি জানি না যে, আমি মহানবী (সা.) কে কী বলব, আর কী উত্তর দিব। তুমি তো এটিই চাও যেন আমি তোমার নির্দোষ হওয়ার সাক্ষ্য দিই। এরপর আমি আমার মাকে বললাম, আপনিই মহানবী (সা.)-কে আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিন। তিনি বলেন, খোদার কসম, আমি জানি না যে, আমি মহানবী (সা.)-কে কি বলব। হযরত আয়েশা বলেন, আমি স্বল্প বয়স্কা মেয়ে ছিলাম, তখন আমার কুরআনের জ্ঞান খুব একটা ছিল না। তা সত্ত্বেও তখন আমি বললাম, খোদার কসম, আমি জানতে পেরেছি আপনারা সে কথা শুনেছেন যা সম্পর্কে মানুষ পরস্পর কানাঘুষো করছে। অর্থাৎ আমার ওপর অত্যন্ত নোংরা এই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে আর আপনারা হয়তো ধরে নিয়েছেন সেই কথা সঠিক। এখন আমি যদি আপনাদের বলি যে, আমি নির্দোষ, আমি এমন কিছুই করি নি, আর খোদা তা'লা জানেন যে, আমি সত্যিই নির্দোষ, আপনারা বিশ্বাস করবেন না যে, আমি সত্য বলছি। কেননা এ কথা এত ছড়িয়ে পড়েছে আর মানুষ এত বেশি বলাবলি করছে যে, মনে হতে পারে আমি সত্যিবাদিনী নই। আর আমি যদি কোন কথা আপনাদের সামনে স্বীকার করি অথচ আল্লাহ্ জানেন যে, আমি নির্দোষ, আর আমি এমন কোন কাজ করি নি, এমন কোন অপকর্ম করিনি, তাহলে আপনি আমার এই স্বীকারোক্তিকে সত্য মনে করে বসবেন। অর্থাৎ মেনে নিলে আপনি মনে করবেন যে, হ্যাঁ কথা ঠিকই হবে। তিনি বলেন, আমি বললাম খোদার কসম, আমি আপনার এবং আমার মধ্যকার বিষয়টির জন্য ইউসুফের পিতার বিষয় ছাড়া আর কোন তুলনা খুঁজে পাই না। তিনি বলেছিলেন যে, ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম আর আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিত। অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আ.) ইউসুফের ভাইদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছিলেন যে,তোমরা যে কথা বলছ তার মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমি এই আয়াত পাঠ করি। এরপর আমি সেখান থেকে উঠে যাই আর আমার বিছানায় চলে আসি। আর আমি আশা করছিলাম যে, খোদাতা'লা আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করবেন। আমি জানতাম যে, আমি নির্দোষ, তাই আল্লাহ্ আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করবেন, কিন্তু আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, আমার সম্পর্কে কোন ওহী নাযেল হবে। এই বিশ্বাস তো ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা নির্দোষ সাব্যস্ত করবেন কিন্তু এই ধারণা ছিল না যে, বিষয় এ পর্যন্ত গড়াবে যে, খোদা তা'লাআমার নির্দোষ হওয়া সংক্রান্ত ওহী নাযেল করবেন। বরং আমার ধারণা মতে আমি এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ ছিলাম যে, আমার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হবে। আমি নিজেকে এর যোগ্য মনে করতাম না যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে আমার সম্পর্কে কোন ওহী নাযেল করবেন। কিন্তু আমার এই আশা অবশ্যই ছিল যে, মহানবী (সা.) শয়নে এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন যাতে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে নির্দোষ আখ্যায়িত করবেন। হযরত আয়েশা বলেন, খোদার কসম, তিনি (সা.) নিজের আসন থেকে তখনও উঠেননি আর নবী পরিবারেরও কেউ বাইরে যায় নি, এমন সময় তাঁর প্রতি ওহী হয়। ওহী অবতরণকালে তাঁর যে মারাত্মক কষ্ট হতো তিনি সেই কষ্টের সম্মুখীন ছিলেন। ওহী অবতরণকালে তাঁর এতো ঘাম ঝরতো যে, শীতকালেও তার পবিত্র বদন থেকে মুক্তো সদৃশ বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরতো।

ওহীর এই অবস্থা যখন মহানবী (সা.) এর ওপর থেকে অপসৃত হচ্ছিল তখন তিনি মৃদু হাসছিলেন। আর প্রথম কথা যা তিনি উচ্চারণ করেন তা হলো, আয়েশা!তুমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে নির্দোষ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, তখন আমার মা বলেন, উঠ, মহানবী (সা.) এর কাছে যাও। তিনি বলেন, মোটেই নয়, আমি উঠে তাঁর কাছে যাব না, আর আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করবো না। আল্লাহ্ তা'লা এই ওহী করেছেন যে, যারা অপবাদ আরোপ করেছে তারা তোমাদেরই গুটিকতক ব্যক্তি। আমাকে নির্দোষ আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা যখন এই আয়াত নাযেল করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম, মিসতা আয়েশার ওপর অপবাদ আরোপ করেছে, আমি এরপর তার ব্যয়ভার আর বহন করবো না। নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে তিনি মিসতা বিন আসাসার ভরণপোষণ করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অর্থাৎ সূরা নূরের সেই আয়াত নাযেল করেন যা আমি পূর্বেই পাঠ করেছি, এর অনুবাদ হলো- তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও সামর্থ্যবানরা নিজেদের নিকটাত্মীয়, মিসকিন এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদের কিছু না দেওয়ার শপথ যেন না করে। তাদের উচিত ক্ষমা ও মার্জনা করা। তোমরা কি পছন্দ করবে না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা অতীব ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, কেন নয়, আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই পছন্দ করব যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার পাপ ঢেকে রেখে আমায় ক্ষমা করবেন। এরপর মিসতাকে তিনি যে খাবার সরবরাহ করতেন তা পুনরায় চালু হয়।

রসূলুল্লাহ্(সা.) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশকেও আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, যয়নব! তুমি তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কি মনে কর? তিনি বলেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল আমি আমার কান এবং চোখকে পাপমুক্ত রাখব। আমি আয়েশা সম্পর্কে এমন কথা কখনো বলতে পারবো না, আমি তো তাকে সতীসাধ্বীই পেয়েছি। অর্থাৎ আমার কান এবং চোখকে আমি রোগব্যধিমুক্ত ও সুস্থ মনে করি, আর সবসময় এগুলোর হিফাযত করব। আমি অন্যায় কথা বলতে পারি না। আমি আয়েশাকে সতীসাধ্বীই দেখেছি এবং তা-ই মনে করি। হযরত আয়েশা বলেন, মহানবী (সা.) এর স্ত্রীদের মাঝে ইনিই সেই যয়নব ছিলেন যিনি সবসময় আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। পরহেযগারির কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে রক্ষা করেছেন। তার বোন হামনা বিনতে জাহাশ যারা অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের পক্ষপাতিত্ব করে ধ্বংস হয়ে গেছে।

(সহী বুখারী কিতাবুশ শাহাদত, বাব তাদিলুন নিসা, হাদীস-২৬৬১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত আয়েশার এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যা আমি ইতিপূর্বে বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেছি। তিনি এতে অতিরিক্ত যা লিখেছেন তা হলো, তিনি বলেন, সেই সাহাবী যখন ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়েন তখন আমি জেগে উঠি আর যেহেতু পর্দার নির্দেশ এসে গিয়েছিল তাই আমি তাকে দেখতেই ওড়না দ্বারা আমার মুখ ঢেকে ফেলি। খোদার কসম, তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেন নি। আর তার মুখ থেকে সেই বাক্য অর্থাৎ ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন ছাড়া আমি আর কিছু শুনি নি। এরপর তিনি তার উট সামনে নিয়ে আসেন। আর আমার পাশে এটিকে বসিয়ে দেন। এরপর তিনি উটের উভয় হাঁটুর ওপর নিজের পা রাখেন যেন উট হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যেতে না পারে। আমি উটে আরোহন করি। এরপর হযরত আয়েশা (রা.) যেমনটি বর্ণনা করেছেন যে, আমার সম্পর্কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে যে ওহী নাযেল হয়েছিল আমার দৃষ্টিতে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কেননা আমার এমন কোন আশা ছিল না।

যাহোক এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল আর নবী-পরিবারের ওপর অনেক বড় এক অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল। হযরত আয়েশার একটি বিশেষ পদমর্যাদা ছিল। এই পদমর্যাদার কারণ হলো মহানবী (সা.) বলেছেন, আয়েশার ঘরেই আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ওহী হয়। সূরা নূরে এই অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে মু'মিনদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত সেসম্পর্কে বিশদ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। এ সংক্রান্ত দশ এগারোটি আয়াত রয়েছে। যাহোক হযরত আয়েশা যে আয়াতের বরাত টেনেছেন, এর তফসীর করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হাদীসের বরাতে সেই ঘটনা যা আমি বর্ণনা করেছি এর সাথে যে অতিরিক্ত কিছু কথা আছে তা তুলে ধরছি। প্রথমে আয়াতটি পড়ছি। আয়াত হলো -

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয় যারা মিথ্যা বানিয়েছে তারা তোমাদেরই একটি শ্রেণি। এই বিষয়টিকে নিজেদের জন্য অশুভ মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যে পাপ করেছে তার জন্য রয়েছে তার পরিণতি। আর যে এর সিংহভাগের জন্য দায়ী তার জন্য অনেক বড় শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা নূর: ১২)

এরপর বিস্তারিত বর্ণনা সংবলিত আরো অনেক আয়াত আছে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই আয়াতের তফসীরে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি লিখেছেন যে, মদীনায় পৌঁছলে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল এবং তার সাথিরা এই গুজব ছড়িয়ে দেয় যে, হযরত আয়েশা নাঊযুবিল্লাহ্ ইচ্ছাকৃতভাবে পিছনে থেকে যান। আর সাফওয়ানের সাথে তার সম্পর্ক ছিল যিনি পরে উট নিয়ে এসেছিলেন। তিনি লিখেন যে, এই হইচই এতটা ছড়িয়ে পড়ে যে, অজ্ঞতাবশত কিছু সাহাবীও তাদের দলে যোগ দেয়। তাদের মাঝে একজন হলেন হযরত হাস্সান বিন সাবেত, দ্বিতীয় জন হলেন হযরত মিসতা বিন উসাসা, একইভাবে এক মহিলা সাহাবী হামনা বিনতে জাহাশও ছিলেন যিনি মহানবী (সা.) এর শ্যালিকা ছিলেন। এই ঘটনার কারণে হযরত আয়েশা (রা.) যেহেতু সুগভীর মর্মযাতনা পেয়েছিলেন আর তিনি যেহেতু অল্প বয়সে একটি জঙ্গলে একা রয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে প্রচণ্ড ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, মদীনায় পৌঁছে এই মর্মযাতনার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন, নিসঙ্গতা-নির্জনতার একটি ভয় ছিল। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, অসুস্থতার কারণ এটিও ছিল। অপরদিকে তার সম্পর্কে মুনাফেকদের ভিতর গুজব ছড়াতে থাকে। অবশেষে এসব কথা মহানবী (সা.) এর কর্ণগোচর হয়। হযরত আয়েশার অসুস্থতা দেখে তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন না আর তাকে জিজ্ঞেসও করেন নি যে, মুনাফেকরা এসব কী বলছে। অপরদিকে কথা প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে পড়ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এটি দেখে আশ্চর্য হতাম যে, মহানবী (সা.) যখন ঘরে আসতেন তখন তার চেহারা বিষন্ন দেখাতো। আমার সাথে কোন কথা বলতেন না। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ থাক। আর অন্যদের কাছে আমার খবরাখবর নিয়ে চলে যেতেন। তিনি বলেন, তার অনুমতি নিয়ে আমি একদিন আমার পিত্রালয়ে চলে যাই। এরপর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া সংক্রান্ত সেই ঘটনা ঘটে। তার আত্মীয়ারসাথে বাইরে যেতেন। তিনি তার পুত্র মিসতার নাম উল্লেখ করে বলেন যে, মিসতার অমঙ্গল হোক। হযরত আয়েশা এটি শুনে জিজ্ঞেস করেন যে, এমনটি কেন বলছ। সেই মহিলা বলেন, এমনটি কেন বলবো না, তুমি কি জান না যে, সে এ ধরনের কথা বলছে! হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেন যে, মনে হয় যেন সেই মহিলা সেই কথাটি বলার কোন সুযোগ সন্ধান করছিল। হযরত আয়েশাকে অবহিত করতে চেয়েছিলেন যে, কী অপবাদ আরোপিত হচ্ছে, কেননা তিনি জানতেন না। তার কাছে এই কথা শুনার পর হযরত আয়েশা যারপরনায় দুঃখ ভারাক্রান্ত হন এবং ফিরে আসেন। যেভাবে তিনি পূর্বেই বলেছেন যে, আমার খুব বেশি দুর্বলতা ছিল,কোনভাবে ঘরে পৌঁছলাম, কিন্তু এর ফলাফল যা বের হয় তা হলো, রোগ আরো বেড়ে যায়।

যাহোক এরপর তিনি এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হযরত ওমর, হযরত আলী এবং ওসামা বিন যায়েদকে ডেকে পরামর্শ করেন যে, এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। হযরত ওমর এবং উসামা বিন যায়েদ বলেন, এটি মুনাফেকদের ছড়ানো কথা, এতে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু হযরত আলী উগ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বলেন, কথা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, এমন মহিলা, যার ওপর অপবাদ আরোপিত হয়েছে তার সাথে সম্পর্ক রাখার আপনার কী প্রয়োজন? কিন্তু একই সাথে তিনি এটিও বলেন, যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, আপনি তার দাসীকে জিজ্ঞেস করুন। কোন কথা যদি (লুক্কায়িত) থাকে তাহলে সে জানিয়ে দেবে। মহানবী (সা.) হযরত আয়েশার সেবিকা বারীরাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হযরত আয়েশার কোন দুর্বলতার কথা তুমি জান কি? সে উত্তর দেয় যে, হযরত আয়েশার এ ছাড়া আর কোন দোষ নেই যে,তিনি স্বল্প-বয়স্কা হওয়ার কারণে ঘুমিয়ে পড়েন আর এরপর সেই ঘটনা বর্ণনা করে। অর্থাৎ তাড়াতাড়ি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন আর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। যাহোক এরপর মহানবী (সা.) বাইরে আসেন, সাহাবীদের সমবেত করেন এবং বলেন, কেউ আছে কি যে আমাকে সেই ব্যক্তির কবল থেকে রক্ষা করবে যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের কথা বলছিলেন কেননা সে-ই কষ্ট দিয়েছিল। হযরত সাদ বিন মায, যিনি অউস গোত্রের সর্দার ছিলেন, দণ্ডায়মান হন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যদি সে ব্যক্তি আমাদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে

মহানবী (সা.)-এর হাদীস

মহানবী (সা.) বলেছেন- " আল্লাহ্ তা'লা যখন কোন ব্যক্তির জন্য মঙ্গলকর কিছু নির্ধারণ করেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দেন।" -(বুখারী)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

হত্যা করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আর সে যদি খাযরাজ গোত্রের সদস্য হয় তাহলেও আমরা তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত আছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,শয়তান সর্বক্ষণ অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুযোগের সন্ধানে থাকে। এই সময়েও শয়তান বিরত হয়নি। খাযরাজের মাথায় এই চিন্তা আসেনি যে, এই ঘটনার ফলে মহানবী (সা.) কতটা কষ্ট পেয়েছেন। সাদ যখন এই কথা বলেন অর্থাৎ সাদ বিন মায যখন এই কথা বলেন তখন দ্বিতীয় গোত্র ক্ষেপে যায়। অতএব সাদ বিন উবাদা দণ্ডায়মান হন আর সাদ বিন মাযকে বলেন যে,তুমি আমাদের লোককে হত্যা করতে পারবে না আর এমনটি করার শক্তিও তোমার নেই। এই কথার সময় আরেক সাহাবীও দাঁড়িয়ে যান আর তিনি বলেন যে, আমরা তাকে হত্যা করব আর দেখব যে, কে তাকে রক্ষা করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার পরিবর্তে অউস আর খাযরাজ গোত্র খাপ থেকে তরবারি টেনে বের করা আরম্ভ করে এবং রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়। মহানবী (সা.) বড় কষ্টে তাদেরকে বিরত করেন। অউস গোত্র বলে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্(সা.) কে কষ্ট দিয়েছে তাকে আমরা হত্যা করবো আর খাযরাজ বলে যে, তোমরা এই কথা আন্তরিকতার কারণে বলছো না কেননা তোমরা জান যে, সে ব্যক্তি আমাদেরই একজন, তাই তোমরা এই কথা বলছো। যাহোক এটিও প্রমাণিত বিষয় যে, উভয় গোত্রের মহানবী (সা.)এর প্রতি ভালোবাসাও ছিল, কিন্তু শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। হযরত মুসলহ মওউদ (রা.) লিখেন যে, তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তি সহজেই আঁচ করতে পারে যে, পরিস্থিতি কত বেদনাঘন হবে। একদিকে মহানবী (সা.) এত মর্মপীড়ায় ভুগছিলেন অপরদিকে মুসলমানদের মাঝে তরবারির যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সুতরাং শয়তান অনেক সময় নেক লোকদেরও এরূপ অবস্থার মাঝে ঠেলে দেয়।

যাহোক এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ সেই ঘটনা বর্ণনা করেন যা হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি আমি স্বীকার করি তাহলে ভুল বলা হবে আর যদি নির্দোষ হওয়ার দাবি করি তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। তাই এখন আমি সেই কথাই বলব যা হযরত ইউসুফের পিতা ইয়াকূব (আ.) বলেছিলেন যে, فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ অর্থাৎ উত্তম ধৈর্য ধারণ করাই আমার জন্য যথোচিত। আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছেই সাহায্য যাচনা করা যেতে পারে আর যাচনা করা হয়। (সূরা ইউসুফ: ১৯) তিনি (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা বলেন, আমি সেখান থেকে উঠে আমার বিছানায় চলে আসি। এরপর সেই আয়াত নাযেল হয় যা পূর্বেই আমি পড়েছি। অর্থাৎ যারা ভয়াবহ মিথ্যা বলেছে তারা তোমাদেরই একটি শ্রেণি, কিন্তু এটিকে তোমরা নিজেদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না বরং কল্যাণকর মনে কর। কেননা এই অপবাদের কারণে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের শাস্তি কী হওয়া উচিত তার উল্লেখ এসে গেছে। আর তোমরা একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছ। অবশ্যই তাদের মাঝে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ পাপ অনুসারে শাস্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি এই পাপের বড় অংশের জন্য দায়ী, সে অনেক বড় শাস্তি পাবে। যাহোক এই ওহীর পর মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারা আলোকোজ্জ্বল হয়। হযরত আয়েশা বলেন, তখন আমার মা বলেন যে, মহানবী (সা.) এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি এই উত্তরই দিয়েছি যে, আমি কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৯-২৭১ থেকে সংকলিত)

যাহোক যেভাবে পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এক জায়গায় খুতবায় এটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশার ওপর অপবাদ আরোপের কারণে তিন ব্যক্তিকে চাবুক মারা হয়েছিল। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হাস্‌সান বিন সাবেত। তিনি মহানবী (সা.) এর সব চেয়ে বড় কবি ছিলেন। একজন ছিলেন মিসতা। তিনি হযরত আবু বকরের খালাতো ভাই ছিলেন। তিনি এত দরিদ্র ছিলেন যে, হযরত আবু বকরের ঘরেই থাকতেন, সেখানেই খাবার খেতেন আর তিনিই তার জন্য পোশাকও দিতন। এছাড়া একজন মহিলাও ছিল। এই তিন জনেরই শাস্তি হয়েছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৮, পৃ: ২৭৯-২৮০)

আর সুনানে আবু দাউদেও এই শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। যহোক কারো কারো মতে এই শাস্তি হয়েছে আর কারো করো মতে হয় নি। শাস্তি হয়েছে কি হয়নি তা ভিন্ন কথা কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জাগতিক শাস্তি যা পাওয়ার ছিল তা পেয়েছেন। আর আমি যেভাবে বলেছি, পরবর্তী যুদ্ধগুলোতেও তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। তার অর্থাৎ মিসতার একটি বড় পদমর্যাদা ছিল। তার পরিণতিও শুভ হয়েছে। তার এই মর্যাদাকে আল্লাহ্ তা'লা অক্ষুণ্ন রেখেছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। (আমীন)

যুক্তরাজ্যে ১৫তম শান্তি সম্মেলনের সফল আয়োজন

তিথি-১৭ই মার্চ, ২০১৮,

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্য বিগত কয়েক বছর যাবৎ প্রতি বছর একটি শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে যাতে মূল বক্তব্য রাখেন হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) । উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে একটি শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। বিগত বছর ১৭ই মার্চ, ২০১৮ সালে ১৫তম শান্তি সম্মেলন বায়তুল ফুতুহ্‌র তাহেরহলে অনুষ্ঠিত হয় যাতে প্রায় সাড়ে পাঁচশ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর জামাত আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের আমীর রফিক আহমদ হায়াত সাহেব অতিথিদের উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, উগ্রবাদ এবং উগ্রপন্থা কখনো সফল হতে পারে না। ঐক্য এবং সংহতিই যাবতীয় সমস্যার সমাধান খোঁজার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

এরপর সম্মানীয় অতিথিদেরকে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়ে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানানো হয়।

মানবাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ডক্টর অ্যারোন রোডস আক্ষেপ জানিয়ে বলেন, জামাত আহমদীয়া যারা কি না মানবাধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অহর্নিশি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে কট্টরবাদী এবং বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধীতা এবং অত্যাচারপূর্ণ আচরণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং তাদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন বিষয়ক ইউরোপীয় অঞ্চলের সদর ডক্টর লুইগি ডি সালিভা বলেন, পনেরো বছর থেকে জামাত আহমদীয়া শান্তি সম্মেলেনে আয়োজন করছে যেটি আমাদের এই মহাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। এই অনুষ্ঠানে মানবতা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, বিপদাপদ এবং সেগুলির পূর্ণাঙ্গীন সমাধান পেশ করা হয়ে থাকে।

মিসেস এঞ্জেলিনা আলেকসিভা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এবছর আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার অর্জনকারী ডক্টর লিওনিদ রোশাল-এর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, ডক্টর রোশাল সাহেব শান্তি পুরস্কারের পুরো অর্থ এমন একটি সেবা প্রতিষ্ঠানকে দান করবেন যেখানে মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মেরুদণ্ডের ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মত করে বিশ্ব শান্তির জন্য প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

এরপর হুযুর আনোয়ার ইংরেজিতে ভাষণ প্রদান করেন। সর্বপ্রথম হুযুর আনোয়ার উপস্থিতবর্গকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু বলেন। এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন, সর্ব প্রথম আমি এই শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য সমস্ত অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বিগত পনের বছর থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাত শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে। হয়তো কারো মনে এই প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, প্রতি বছর এই শান্তি সম্মেলন আয়োজন করে লাভ কি? কেননা, মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে শান্তি পরিস্থিতিতে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন চোখে পড়ে নি। বরং পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানই পারস্পরিক ভেদাভেদ, বিদ্বেষ এবং অন্যায়-অবিচারের কবলে। সমাজ বিভিন্ন শক্তির দিকে আকৃষ্ট হয়ে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে পড়েছে। যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে, আর জাতিসমূহ পরস্পরকে হুমকি দিচ্ছে। উন্নত থেকে অনুন্নত প্রত্যেকটি দেশেই অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এমন পরিস্থিতিতে যদি আপনার মনে সন্দেহ জাগে তবে তা যথোচিত। কিন্তু আমাদের ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, ধনী হোক বা দরিদ্র, দুর্বল হোক বা সবল, স্বধর্মের হোক বা ভিন্ন ধর্মের, আমরা যেন সমস্ত জগতবাসীকে শান্তি ও সুবিচারের দিকে আহ্বান করতে থাকি। এই কারণে আমরা পৃথিবীকে উচ্চ মানবীয় মূল্যবোধের মহত্ব চেনানোর, তা অবলম্বন করার এবং তাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার আমাদের কর্তব্য পালন করে যাব। ইসলামের মূল শিক্ষাই হল আল্লাহ্‌র অধিকার এবং তাঁর বান্দার অধিকার প্রদান করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর আমি আজ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যা বর্তমান বিশ্বে ভীষণ অস্থিরতা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 17 Jan, 2019 Issue No.3

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তৈরী করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমান বিশ্বে আমরা প্রায়শই দেখি যে, কয়েকটি পরাশাক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এমন পরিকল্পনা তৈরী করে যার মাধ্যমে তারা বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাপনের মান উন্নত করতে চায়। সাম্প্রতিককালে এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে অনেক রাজনীতিবিদ এবং চিন্তাবিদ একত্রিত হয়ে মুখর হচ্ছে এবং সচেতনা গড়ে তুলছে। সেই বিষয়টি হল পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রকৃতির ভারসাম্য এবং বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে কার্বন নির্গমন থেকে উদ্ভুত সমস্যাবলী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, নিঃসন্দেহে জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রভাবিত ও প্রতিহত করতে পারে এমন পদক্ষেপ এবং এই গ্রহকে রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় বিষয়। কিন্তু এর পাশাপাশি উন্নত দেশসমূহ, বিশেষকরে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব যেন এবিষয়ের প্রতি সচেতনা গড়ে তোলে যে, পৃথিবীতে অন্যান্য আরও কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেগুলির প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক, এর একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীতে দারিদ্র ও অনাহারক্লিষ্ট অসংখ্য মানুষ পরিবেশ ও কার্বন নির্গমণের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে সক্ষম নয়, কেননা প্রতিদিন সকালে এই চিন্তা নিয়ে তাদের ঘুম ভাঙ্গে যে, আজ তারা নিজের সন্তানকে এক বেলার আহার জোটাতে পারবে কি না? তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা এতটাই ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যার যন্ত্রণা আমরা অনুভব করতে সক্ষম নই। যেমন– পৃথিবীর এমন অনেক দেশ আছে যেখানকার নাগরিকরা শুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। কুপের নোংরা জল খেতে এবং প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। আর সেই জলও সহজলভ্য নয়। মহিলা ও শিশুরা প্রতিদিন কয়েক মাইল পাঁয়ে হেঁটে জলের পাত্র মাথায় রেখে পরিবারের জন্য জল বয়ে আনে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই সমস্যাবলীর উপর আমরা কেবল একবার দৃষ্টিপাত করেই যেন ধরে না নিই যে, এটি তো অন্যদের সমস্যা। বরং আমাদের জানা উচিত যে, এই দারিদ্রের প্রভাব গোটা পৃথিবীর উপরই পড়ে থাকে এবং এটি সরাসরিভাবে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। যে সমস্ত শিশুরা সারা দিন কষ্ট করে পাঁয়ে হেঁটে পরিবারের সদস্যদের জন্য পানি বহন করেই কাটিয়ে দেয়, স্বাভাবিকভাবেই তারা না স্কুলে যেতে পারবে, না কোনও প্রকার শিক্ষালাভ করতে পারবে। তারা এমন এক আবর্তে বাঁধা পড়ে আছে যেখানে অজ্ঞতা এবং দারিদ্রের বাঁধন তাদেরকে চিরতরে আঁকড়ে ধরে আছে। এটি এমন এক জীবন চক্র যা সমাজের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হবে। বর্তমান বিশ্বে এই দারিদ্রের কষ্ট প্রচার মাধ্যমের উন্নতির সুবাদে সকলের সামনে রয়েছে। কেননা, দারিদ্রের জাঁতাকলে পড়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশগুলির জনসাধারণও দেখছে যে, ধনী ও শক্তিধর দেশগুলিতে মানুষ কেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন অতিবাহিত করছে। যখন তারা অপরকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে দেখে, তখন নাগরিক সমাজে মানবাধিকারের মধ্যে এমন পারস্পরিক বৈষম্য তাদের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তার উপর কাটা ঘায়ে নুনের ছেটা দেওয়ার কাজ করে উগ্রবাদী উপাদানসমূহ, যারা তাদের আবেগকে উসকে দিয়ে আর্থিকভাবে সাহায্য করে এবং স্ত্রী-সন্তানের জন্য কেবল উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্নই দেখায় না, বরং তা অর্জন করানো জন্য প্রতিশ্রুতিও দেয়। অনুরূপভাবে অশিক্ষিত যুবকরা এই চক্রের ফাঁদের পা বাড়ায়। তারা এদের মন-মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের মনে উগ্রবাদের চিন্তাধারা প্রবেশ করিয়ে দেয়। যখন দেশের নেতারা জনসাধারণের অধিকারসমূহ হরণ করে হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তখন এরা অধিকাংশ সময় এমন বিষয়কে কাজে লাগায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সব থেকে বড় পরিতাপের বিষয় হল, দারিদ্রের জাঁতাকলে পড়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত এই দেশগুলির নেতারা নিজেদের দেশের সুখ-সমৃদ্ধির চিন্তা এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টার পরিবর্তে প্রায়ই নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ, উঁচু পদ এবং ক্ষমতা বজায় রাখার মাধ্যমের প্রতি নিজেদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। ফলে জনসাধারণের মনে নেতাদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম নেয় এবং বৃহৎ শক্তিগুলিকে তারা নিজেদের শত্রু বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এটি এমনই এক বিড়ম্বনা যার ভয়াবহ চিত্র আমরা মুসলমানদেশগুলিতে দেখতে পাই। যে সমস্ত মুসলমান বিদেশে লালিত-পালিত হয়েছে, তাদের অনেকে নিজেদের পিতৃভূমির এমন ভয়াবহ যন্ত্রণা ও দুর্দশার চিত্র দেখে উগ্রবাদের ভাবধারাই প্রভাবিত হয়ে মানসিক বিকারের শিকার হয়েছে এবং তারা পশ্চিমি দেশগুলিতে ভয়ানক হামলা করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি পুরো জোর দিয়ে একথা বলতে পারি যে, আমরা যদি আন্তরিকতার সাথে নিজেদের পৃথিবীকে রক্ষা করতে চাই এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ সমাজ রেখে যেতে চাই, তবে আমাদেরকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জীবন যাপনের মান যথাযথভাবে উন্নত করার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করতে হবে। অভাবপীড়িত দেশগুলিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে তাদেরকে মানবজাতির অঙ্গ বলে আমাদেরকে মনে করতে হবে। তারা আমাদেরই ভাই-বোন। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড় হওয়ার জন্য আমরা যে অনুদান দিই, সমান সুযোগ এবং আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি তৈরী করার জন্য আমরা যে সহায়তা দান করে থাকি, বস্তুত তা আমাদের নিজেদেরকেই সাহায্য করা হচ্ছে বলে বিবেচিত হবে, যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে শান্তি সম্ভব করে তুলতে পারব। অন্যথায় আমরা দেখতে পাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দারিদ্র ও অস্বচ্ছলতার নেতিবাচক প্রভাব অবশিষ্ট বিশ্বকেও গ্রাস করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এছাড়াও সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসবাদের ঘটনাবলী, পশ্চিমি দেশগুলিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের পলায়নের প্রবণতা এবং পশ্চিমি বিশ্বে উগ্র জাতীয়তাবাদের ব্যপক প্রসার– এগুলি এমন বিষয় যা পৃথিবীতে এক অন্ধকারময় যুগের ভয়াবহতার স্মৃতির ফিরিয়ে আনছে। দক্ষিণপন্থীদের কট্টরবাদী সংগঠনগুলির কথা মনোযোগ সহকারে শোনা হচ্ছে, এটিও বেশ উদ্বেগের কারণ। রাজনৈতিক অলিন্দেও এদের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারাও উগ্রবাদী যারা বিভিন্ন জাতি, বর্ণ বা ধর্মাবলম্বী মানুষদের বিরুদ্ধে সমাজে বিষোদ্গার করতে চায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটিও এক বাস্তবতা যে, শক্তিধর দেশগুলির মুষ্টিমেয় নেতা নিজেদের বিবৃতি দানের সময় জাতি বৈষম্যের উপর অনেক বেশি জোর দিতে আরম্ভ করেছে, কেননা, তারা জনগণের কাছে এই অঙ্গীকার করে রেখেছে যে, যাবতীয় বিষয়ের উপর তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এবিষয়ে আমার দ্বিমত নেই যে, সরকার এবং নেতাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল নিজেদের নাগকিরকদের অধিকার রক্ষা করা। এই কথাটি এই সীমা পর্যন্ত সঠিক। যতদূর এই নেতারা ন্যায় নীতি অবলম্বন করে চলে এবং অন্যের অধিকার হরণ করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত নাগরিকদের জীবনযাপনের মান উন্নত করা তাদের জন্য কৃতিত্বের বিষয়। কিন্তু যে কর্মসূচি এমন নীতির উপর তৈরী করা হয় যাতে কায়েমি স্বার্থ, লোভ এবং অপরের অধিকার হরণ করা প্রবণতা থাকে সেগুলি ভ্রান্ত। তা পৃথিবীতে ভেদাভেদ এবং পারস্পরিক ব্যবধান সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। (অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়....)

ইমামের বাণী

"তোমরা পরস্পর যথাশীঘ্র মীমাংসার কর এবং আপন ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি মার্জনা কর, কেননা সেই ব্যক্তি মন্দ যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসায় সম্মত হয় না।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

আল্লাহ্‌র বাণী

"ন্যায়সঙ্গত কথা এবং ক্ষমা সেই দান হইতে উত্তম যাহার পরে কষ্ট-ক্লেশ আরম্ভ হইয়া যায়।"

(আল বাকারা: ২৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir